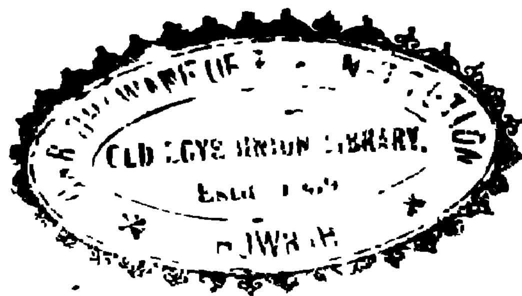
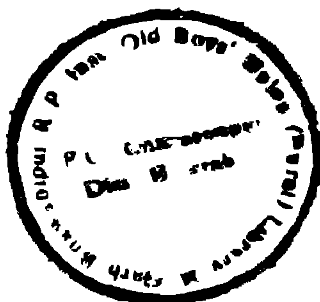


UNION LIBRARY.

ভিন্‌দেশী



শুভেন্দু ঘোষ



সমবায় পাবলিশার্স
ক লি কা তা

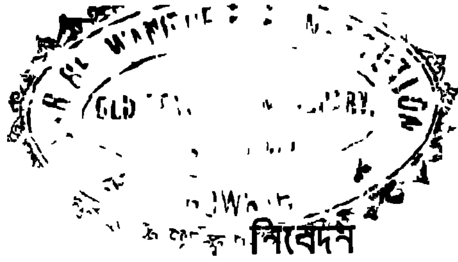
প্রাপ্তিস্থান : বুক ফোরাম :: ৭২, হ্যারিসন রোড :: কলিকাতা

সমবায় পাবলিশার্স, ৩৩-২, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
মহাদেব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ
১৯৪৫

মূল্য পাঁচ সিকা

ভিক্টোরী কোম্পানী, ১৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
হরিপদ দাস কর্তৃক মুদ্রিত।



নিবেদন

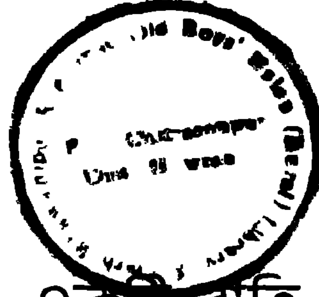
গল্প-সাহিত্যের সমাদর আজকাল বাংলাদেশে অনেক বেশি বেড়েছে। বাংলা সাহিত্যে মৌলিক গল্প রচনার সম্পদও দিন দিন বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন দেশী সাহিত্যে যে রসসম্ভার রয়েছে, তার গতি ও পরিণতি যে দিকে চলেছে তার পরিচয় নেওয়ার আগ্রহও এদেশে বাড়ছে। সেই কারণে অনুবাদ সাহিত্য আমাদের কাছে বর্তমানে একান্ত মূল্যবান।

মানুষকে নিয়েই সকল দেশের সকল সাহিত্যই রচিত, ভিন্ন ভাষার আড়ালে সেই একই মানুষের কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ভাষার আবরণ যদি সন্তর্পণে অপসারণ করা যায় তবে ভিন্‌দেশী হলেও মানুষকে—তার সুখদুঃখের চেতনাকে চিনতে অসুবিধা হয় না। উপরন্তু মানুষের সঙ্গে সেই দেশীয় সমাজ, রীতি ও সংস্কার সবকিছুর সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারি, অনুবাদ সাহিত্যের এই দানও কিছু কম নয়।

অনুবাদক শ্রীযুক্ত শুভেন্দু ঘোষ বাংলা সাহিত্যের একজন সুদক্ষ রচয়িতা। দেশী বিদেশী সাহিত্যের তিনি একজন যথার্থ রসবেত্তা ও বিজ্ঞ বিচারক। অন্য দেশীয় গল্প সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা পাঠকগণের কথঞ্চিত পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মানসে তিনি, চরিত্র-চিত্রনে ও ঘটনাবৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কয়েকটি বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ গল্প নির্বাচন ক'রে বাংলায় ভাষান্তরিত করেছেন। তারাই 'ভিন্‌দেশী' রূপে প্রকাশিত হলো। 'ভিন্‌দেশী'কে পরিচয় করিয়ে দিতে আর কিছু বলার নেই। আশা করি, বাঙালী পাঠকসাধারণের কাছে এরা সমাদর লাভে সমর্থ হবে।

—প্রকাশক

সূচী



—একটী রাত্রি—

রাত্রি এগারটা। প্যারিসের থিয়েটারগুলো তখন গেট বন্ধ করছে। হোটেল, কাফে প্রভৃতি এর আধ ঘণ্টা আগেই খরিদ্দারদের বিদায় ক'রে দিয়েছে। আমার সঙ্গীরা তখন বড় রাস্তার ধারে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে। নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদের জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে জনস্রোত এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। বিমান আক্রমণের ভয়ে রাস্তার ঘোমটা-ঢাকা বিজলী বাতিগুলোর পাণ্ডুর দীপ্তি একটু দূরে গিয়েই অন্ধকারে মুখ লুকোচ্ছে। প্রথম রাত্রির ওপর তারার চাদর টানা ছিল, এখন একটার পর একটা 'সার্চ লাইট' এসে তীব্র দৃষ্টিতে আকাশটাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে শত্রুপক্ষীয় বোমারু বিমানের সন্ধান চালাচ্ছে।

ইচ্ছে হচ্ছিল, ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। দলে ছিলাম আমরা চারজন, একজন ফরাসী লেখক, দু'জন সার্ভিয়ান বাহিনীর ক্যাপ্টেন, আর আমি। এই বিষণ্ণ অন্ধকার নগরীতে একটু স্ফূর্তি করতে যাই কোথায়? সার্ভিয়ান ক্যাপ্টেনদের একজন একটা হোটেলের নাম করলো, সেটা নাকি সমস্ত রাত্রিই খোলা থাকে। সৈনিক অফিসাররা প্যারিসে ছুটী কাটাতে চাইলে সে সময় সোজা ঐখানে গিয়ে উঠতেন। এ কথাটা খুব কম লোকেই জানতো যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈনিক অফিসারেরা এই হোটেলে এসে পরস্পর মেলামেশা করেন, (গোয়েন্দাগিরি প্রভৃতি) অন্য কাজকর্মও সেরে নেন। আমরা খুব সাবধানতার সঙ্গে গিয়ে সেই হোটেলের উজ্জ্বল হল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। বাইরের

অন্ধকার রাস্তার সঙ্গে ভিতরের এই প্রখর ঔজ্জ্বল্যের কি অপরিমেয় বৈষম্য। বোধ হচ্ছিল যেন একটা 'লাইট হাউসের' অভ্যন্তরে এসে দাঁড়িয়েছি। গুচ্ছ গুচ্ছ ইলেকট্রিক বালবের আলো, দেওয়ালে আঁটা বড় বড় আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ঠিক্‌রে পড়ছে। দেখে, যুদ্ধের দু'বৎসর আগেকার এখানকার দৃশ্যটা মানসপটে ভেসে উঠলো: কত বিচিত্র রঙ্গিনী ফ্যাসান-দুরুস্ত মেয়ে, কত শ্যাম্পেন সুরা আর ভায়োলিনের বাজনা, মন-মাতানো গান আর হাবসীদের নৃত্য। কিন্তু উপস্থিত কাউকে সাধারণ নাগরিকের বেশভূষায় দেখা গেল না। সকলেরই পরণে ধূলো-কাদা-মাখা বহুব্যবহৃত স্বজাতীয় উর্দি—ফ্রেঞ্চ, ইংলিস, বেলজিয়ান, রুশীয়ান, সার্ভিয়ান। কয়েকজন ইংরেজ সৈনিক ভায়োলিন বাজাচ্ছিল। আগেকার লালকুর্তা 'জিপ্সীদের' জায়গায় ওরা বেশ জাঁকিয়ে ব'সে ছিল। ওদের মধ্যে একজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, ওর বাপ লর্ড—বংশ ও ধনগৌরবে বেশ একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি।—স্ফূর্তি ক'রে নাও সব। কালকে হয়তো ঘটবে মৃত্যু।

এই লোকগুলো রণদেবতার পায়ে নিজেদের জীবন নিবেদন ক'রে রেখেছে। জীবনের সুরাপাত্র এরা এক চুমুকে পান ক'রে নিয়ে সব চুকিয়ে দিতে চায়। সহর-দেখার-অনুমতি-পাওয়া 'জাহাজী'দের মতো এরা মনের খুসীতে নেচে-কুঁদে, খেয়ে-দেয়ে, প্রেম ক'রে বেড়াচ্ছে,—কাল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে জীবনলীলার হয়তো পরিসমাপ্তি ঘটবে।

সার্ভিয়ান ক্যাপ্টেন দু'জন বয়সে যুবক, স্বদেশের দুর্ভাগ্যের জন্যে তাদের যে প্যারিস দেখার সৌভাগ্য হ'ল, এ ভেবে তারা যেন একটা তৃপ্তি অনুভব করছিল, নিজেদের ছোট্ট নগরটার নীরস জীবনের তুলনায়, বিশাল নগরী প্যারিসের দৃশ্য স্বর্গ বলে বোধ হচ্ছিল।

দু'জনেরই গল্প বলবার একটা চমৎকার ভঙ্গী ছিল, এ গুণ ওদের স্বভাবজ। ওদের দেশে সকলেরই কবি হৃদয়। পঁচাত্তর বৎসর আগে লা'মার্তিন তুরুকদের

অধীন সার্ভিয়ার কোনো এক প্রদেশে পর্যটন কবার সময় ঐ মেষচারকদেব দেশেব কবিত্ব-মহিমা দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। সমস্ত দেশটায় লেখাপড়া জানা লোক কম, কিন্তু পূর্বপুরুষদেব আচার-বিচাব তাবা গাথার আকাবে গ্রথিত ক'বে রেখেছে। গুজলেবোশ ছিলেন সার্ভিয়াব জাতীয় ঐতিহাসিক, তিনি প্রাচীন কথাব সঙ্গে স্বরচিত অনেক গান যোগ ক'বে দিয়ে দেশেব ইতিহাসকে আবও মনোহব ক'বে তুলেছিলেন।

শ্যাম্পেনেব পাত্রে মাঝে মাঝে চুমুক দিতে দিতে ক্যাপ্টেন দু'জন ক'মাস পূর্বেব ঘটনা—সার্ভিয়াব পরাজয় ও সৈন্যদলেব শোচনীয় ছত্রভঙ্গের কাহিনী বলতে লাগলো। ক্ষুধার সঙ্গে, প্রচণ্ড শীতেব সঙ্গে সে কি মারাত্মক দ্বন্দ্ব! বরফেব ওপর লড়াই, এক একজনের সামনে দশ-দশজন শত্রু, শত্রুর আগে আগে ভীতিবিহ্বল মানুষ ও পশুর বিশৃঙ্খল পলায়ন, আর এ সকলের পশ্চাৎ ভাগে দুই পক্ষেব মধ্যে তখনও ভয়াবহ মৃত্যুবিনিময় চলেছে। গ্রাম পুড়ছে, গণ্ডগোলেব মধ্যে শ্রান্ত ও আহতদেব করুণ আর্তধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বাতে পঙ্গু রাজা পীটার একটা সাধারণ যষ্টিমাত্র সম্বল ক'রে কোনো মতে প্রাণে বাঁচলেন। সেক্সপিয়বেব কি যেন একটা দুঃখান্ত নাটকের নায়কের মতো তিনি তখনও নিজেব পরাজিত অশ্বারোহী বাহিনীকে সঞ্চালন ক'রে যাচ্ছিলেন।

সার্ভিয়ান বন্ধুরা গল্প করছিল, ব'সে ব'সে আমি তাদিকে লক্ষ্য করছিলাম। দু'জনেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট যুবা, লম্বা ছিপছিপে শরীর। দু জনেরই নাক বেশ টিকোলো, গৃধ্রচঞ্চুর মতো দুজনেরই মানানসই গোঁফ, গম্বুজাকার টুপির নীচে থেকে ওদের লম্বা লম্বা চুলেব গোছা বেরিয়ে পড়েছে। ওদের মুখভাব চিত্রকরদেব মতো, সেকালের রাজকুমারীরা যাদেব দেখলে ভাবাবেশে মোহিত হয়ে যেত। বাদামী রংয়ের উর্দীতে সুন্দর মানাচ্ছিল ওদের। চেহারায় একটা দৃঢ় প্রশান্ত ভাব, মৃত্যুর সামনে যারা দাঁড়িয়ে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে তাদেরই মধ্যে কেবল এটা সম্ভব ব'লে মনে হয়।

ওরা গল্প ক'রে চলেছে। মাত্র কয়েক মাস আগেকার ঘটনা, শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, যেন কোন্ পৌরাণিক যুগের কাহিনী ব'লে চলেছে—যেন কোন্ দৈত্যপুরীর উপকথা। এই যে দুটি লোক আজ প্যারিসের হোটেলে ব'সে কথা শোনাচ্ছে, অল্পদিন হ'ল এরাই জীবনের ভীষণ রূপের সঙ্গে পরিচয় করেছে, সার্ভিয়ার সমর তাণ্ডব থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরেছে।

ফরাসী বন্ধুটি চ'লে গিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেনদের একজন কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে বারে বারে পাশের কৌচে-বসা এক সুন্দরীর দিকে কটাক্ষপাত করছিল। তরুণীর দৃষ্টিও তার উপর নিবদ্ধ ব'লে মনে হচ্ছিল। ক্যাপ্টেনটির মন প'ড়ে ছিল ঐ দিকে, কিছুক্ষণ পরেই সে সুন্দরীর আকর্ষণে আমাদের কৌচ ছেড়ে তার পাশে গিয়ে বসলো। আরও একটু পর সুন্দরীকে সঙ্গে ক'রে সে বেরিয়ে গেল।

আমি একা অন্য ক্যাপ্টেনটির সঙ্গে র'য়ে গেলাম। এ ছোকরার বয়স কম, কথাবার্তাও সে কম বলে। সুরাপাত্র খালি ক'রে সে ঘন ঘন দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে চাইতে লাগলো। আর এক পাত্র মদ নিয়ে সেটাও যখন ফুরুলো তখন সে আমার পানে যেভাবে চাইতে সুরু করলো, তাতে বুঝলাম যেন প্রাণ খুলে সে কিছু ব'লে ফেলতে চায়। মনে হ'ল, কোনো দুঃখময় স্মৃতি ওর সমস্ত অন্তরকে মথিত ক'রে তুলেছে। সে আবার ঘড়ির দিকে তাকালো। রাত্রি একটা বেজে গিয়েছে।

ঠিক এমনি সময়,—মৌনতা ভেঙে সে বলতে আরম্ভ করলো,—সে আজ চার মাস পূর্ব্বের কথা। ওর কথা শুনতে শুনতে কল্পনার সাহায্যে আমার চোখের সম্মুখে সমস্ত চিত্রটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।—অন্ধকার রাত্রি, মাটিটা বরফে ছেয়ে গিয়েছে, শুভ্র পাহাড়ের ওপর দীর্ঘকায় গাছগুলোয় ঝোড়ো হাওয়া চীৎকার ক'রে ফিরছে, শাখা নাড়িয়ে রাশি রাশি বরফ ঝরিয়ে দিচ্ছে। দেখলাম সম্মুখে পরিত্যক্ত বিধ্বস্ত পল্লী। ভাঙা-চোরা কুঁড়েগুলোর মধ্য থেকে

পরাজিত সার্ভিয়ান সৈন্যরা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পিছু হটছে, পা পা ক'রে আড্রিয়াটিক সাগরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

ক্যাপ্টেন বন্ধুটি ছিল এই পলাতক সৈন্যদলের পশ্চাদ্‌ভাগের একজন অফিসার। সৈনিকদের সুসংহত 'দল' এখন বিশৃঙ্খল জনতায় পরিণত হয়ে পড়েছে, ভয়ার্ত, বিপন্ন কৃষকদের ভীড়ের জন্যে তাদের ঝঞ্ঝাট আরও বেড়ে গিয়েছে। নৈরাশ্যে, শ্রান্তিতে এই কৃষকদের এমনি একটা আচ্ছন্নভাব এসে পড়েছে যে, তারা পথ হাঁটছে যন্ত্রের মতো, পশুর মতো তাদিকে আগে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। বাচ্চাদিকে তাড়না করতে করতে মেয়েরা অতিকষ্টে রাস্তা ভাঙছে, ওদের মধ্যে যারা শক্ত, এই সংকটকালেও তারা মৃত সৈনিকদের বন্দুক আর কার্তুজের পেটী ওঠাতে ওঠাতে সকলের থেকে আগে আগে চলেছে।

আকস্মিক দীপ্তিতে অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে জনশূন্য গ্রামখানির ওপর মধ্যে মধ্যে গোলা ফাটছে, শুধু গোলা নয়, রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারের বুক চিরে, ক্ষমাহীন মৃত্যুর মতো, পলাতকদের ওপর সন্‌-সন্‌ শব্দে গুলিবৃষ্টিও চলছে।

ভোর হ'তে না হ'তেই শত্রুর ভয়ঙ্কর আক্রমণ আরম্ভ হবে। ওরা একটুও জানে না, কোন শত্রু পিছন থেকে তাদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—তারা জার্মান না অষ্ট্রিয়ান? বুলগেরিয়ান না তুরুক?

এতো ছোট্ট একটা দেশ, তাকে এতও সইতে হয়েছিল!

সার্ভিয়ান বন্ধু ব'লে যাচ্ছিল, "পিছন হটা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। যারা পিছিয়ে পড়ছিল, তাদিকে ফেলে আসতে হচ্ছিল। ভোরের আগেই পাহাড়ে পৌঁছে আশ্রয় নেওয়ার দরকার।"

পুরুষ, মেয়ে, ছেলে, বুড়ো, মাল বোঝাই খচ্চরশ্রেণীর পিছনে পিছনে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। গ্রামে যারা ছিল, ভাঙা বাড়ীগুলোর আড়াল থেকে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে শত্রুসেনার ওপর তারা অবিশ্রান্ত

চালাচ্ছে। সময় হলে এই বীরদলও পশ্চাৎ-অপসরণেব চেষ্টা কববে। হঠাৎ ক্যাপ্টেনের মন অত্যন্ত চিন্তাবিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো, আহতদের কি হবে? ওদেব নিয়ে কি কবা যায় এখন?

একটা ভাঙা বাড়ীর বডগোছের কামবাব মধ্যে জন-পঞ্চাশ আহত ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছিল, যন্ত্রণায় কাবও অর্দ্ধ-মূর্ছিত অবস্থা, কেউ বা কাৎবাচ্ছিল। ওদের মধ্যে অনেকে কদিন পূর্বেই আহত হয়েছিল, সযত্নে পটি-টটি বেঁধে কোনো মতে এ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে পেবেছিল, কেউ কেউ ঐ বাত্রেই আহত হয়ে যেমন তেমন ভাবে তাড়াতাড়ি পটি বেঁধে বক্তস্রোত সদ্য বন্ধ কবেছে, ফাটন্ত গোলার টুকবো লেগে জখম হওয়া দু'চাবজন মেয়েও সেখানে ছিল।

ক্যাপ্টেন সেই বাড়ীটায় এল। চাবিদিকেব পচা মাংস, শুকনো বক্ত আব ময়লা কাপড়েব দুর্গন্ধে বায়ু বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ক্যাপ্টেনেব সাড়া পেয়ে যাদেব এখনও একটু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাবা নিবু নিবু লণ্ঠনেব ম্লান আলোয় ভীষণ উদ্বেগে খাড়া হবাব চেষ্টায় টলতে লাগলো, কাৎবানি বন্ধ হয়ে গেল। সকলেই ভয়ে বিস্ময়ে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়লো, যেন মৃত্যুব চেয়ে ভয়ানক কিছুব সম্মুখে এসে পড়েছে তাবা।

তাদিকে শত্রুব করুণাব ওপর ছেড়ে দিতে হচ্ছে—এই কথা শুনে আহতরা আর একবাব খাড়া হবার নিস্ফল চেষ্টা ক'বে শক্তিহীনতাব জন্যে তক্ষণি মাটির ওপর গড়িয়ে পড়লো।

আহতদেব করুণ কাকুতি মিনতিতে, হতাশ কণ্ঠেব প্রার্থনায়, ক্যাপ্টেন ও সৈনিকরা বিহ্বল হয়ে উঠলো। 'এখানে ফেলে যাবেন না আমাদিকে, দোহাই ভগবানের—'

ধীরে ধীরে আহতরা বুঝতে পারলো, কেন তাদিকে পিছনে ফেলে যেতে হচ্ছে।' 'যা হয়, হোক' ব'লে ওরা একেবারে হতাশ হয়ে পড়লো। শেষে শত্রুর হাতে পড়বে। হয়তো ওরা বুলগেরিয়ান, হয়তো বা তুরুক—বংশ বংশ ধরে

দেশের শত্রু। মুখের অনুচ্চারিত কথা যেন ওদের মূক দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো—বন্দী হওয়ার চেয়ে মরণও শ্রেয়। যাদের মৃত্যুর আর দেরী নাই, তারাও বন্দী হওয়ার ভয়ে, থেকে থেকে কেঁপে উঠলো।

বুলগেরিয়ান বা তুরুকের প্রতিহিংসা মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ।

'ভাই, ভাই—'

ওদের এই আর্ত-মিনতির গোপন মর্ম বুঝতে পেরে, ক্যাপ্টেন চোখ ফিরিয়ে নিল, ওদের কাছে বার বার জিজ্ঞেস ক'রে নিল, 'তোমরা কি চাও যে, আমি—?"

আহতরা মাথা নেড়ে জানালো, 'হাঁ'। ওদের যেলে যেতেই যখন হবে, তখন একজনও জীবিত সার্ভিয়ানকে যেন শত্রুরা বন্দী করতে না পায়।

ওদের মতো অবস্থা হলে ক্যাপ্টেন নিজেও কি ঐ ভিক্ষাই করতো না? পরাজয় ও বিশৃঙ্খলার জন্যে গুলী-বারুদের কমতি থাকায় সৈন্যরা নিজেদের কার্তুজ খুব হিসেব ক'রে খরচ করছিল। ক্যাপ্টেন খাপ হ'তে তলোয়ার বার করলো। কোনো কোনো সৈনিক সঙ্গীন দিয়েই তাদের অপ্রিয় কর্তব্য আরম্ভ ক'রে দিল, তাদের হাত কিন্তু ভয়ানক কাঁপছিল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে, মুখ ফেটে যন্ত্রণার চীৎকার বেরিয়ে পড়ছে। আহতরা সকলেই উচ্চপদস্থ ক্যাপ্টেনের দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসতে লাগলো। ওর পাকা হাতের ওস্তাদী আঘাতে যে মরণ, তা যেন বেশী সহজ, যেন বেশী গৌরবের!

'আমায় নাও, ভাই, এবার আমার পালা' তলোয়ারের তীক্ষ্ণতম অংশ দিয়ে এক চোটেই ঘাড়ের শিরাটা দুফাঁক ক'রে দেওয়ার চেষ্টাই করছিল ক্যাপ্টেন।

'খট্-খট্'। ক্যাপ্টেন আমাকে ভাল ক'রে বোঝাবার জন্য বললো 'খট্ খট্'!—সমস্ত বীভৎস দৃশ্যটা আমার চোখের সম্মুখে নেচে উঠলো।

হাত পায়ের সমস্ত বল নিয়োজিত ক'রে আহতরা প্রাণ দিতে এগিয়ে আসতে লাগলো। নিজের এই ভয়াবহ কীর্তি যাতে নিজের চোখে দেখতে না হয়, তার জন্যে প্রথম দিকটায় ও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল, কিন্তু এই মানসিক দুর্বলতার ফলে হাত চালনায় তার ভুল হচ্ছিল, একবারের জায়গায় দু'বার আঘাত করতে হচ্ছিল, মিছিমিছি কষ্ট বাড়ানো হচ্ছিল মাত্র। একটু স্থির হয়ে হাত চালানোই ভাল, হাত অভ্রান্ত হওয়া চাই! বুককে পাথরের মতো শক্ত ক'রে রাখা চাই!—খট্‌ খট্‌!

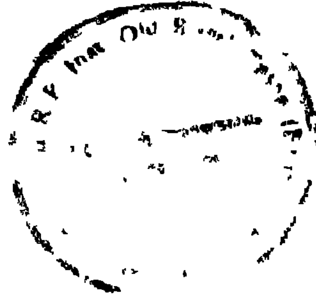
'এবার আমায় মারো, এই তো আমার পালা'। 'পালি' নিয়ে ওরা এমন ঝগড়া করছিল যেন, ওদের ভয়, ওদের বলিদানের আগেই শত্রুরা এসে পড়বে। নিজে থেকেই ওরা কেমন ক'রে যেন বুঝে নিয়েছিল, কোন্ ভঙ্গীতে বসলে আঘাতটা বেশ সাফ হয়ে পড়বে। নিজের 'পালি' এলে প্রত্যেকে মাথাটা এক দিকে হেলিয়ে দিচ্ছিল, যাতে ঘাড়টায় টান প'ড়ে শিরটা ফুলে ওঠে, চোট দেবার সময় যাতে সেটা ভাল রকম নজরে আসে।

'ভাই এবার আমার মাথাটা' আবার রক্ত ছোটে, লাশ লুটিয়ে প'ড়ে ছটফট করতে থাকে।

হোটেলের হল ঘরটা ধীরে ধীরে খালি হচ্ছে। উর্দীপরা সৈনিকদের বাহুলগ্না হয়ে মেয়েরা পাউডার ও সেন্টের গন্ধ ছড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। হর্ষধ্বনির মধ্যে ইংরেজ সৈনিকদের ভায়োলিন বাজনা ক্ষান্ত হ'ল।

এই রক্তরাঙা বীভৎস স্মৃতিটিকে মস্তিষ্কের মধ্যে নিরন্তর সতেজ রাখবার জন্যেই যেন আমাদের সাভিয়ান বন্ধু হাতে একটা পেন্সিল-কাটা চাকু নিয়ে কৌচের হাতার ওপর আওয়াজ ক'রে যাচ্ছে। খট্‌ খট্‌। *

* স্পেনীয় গল্প—(ব্লাস্কো ইবানেজ)



—ব্যাল্‌জাকের উপন্যাস—

সাধারণ পাঠাগারের পঠন-কক্ষে দু-দুটো সকাল কাটিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বইখানা বন্ধ করলাম।

ব্যাল্‌জাকের একটা পুরাণো সংস্করণের ষাটটী খণ্ডের প্রতিখানা একজন বৃদ্ধ সহকারী-গ্রন্থাকারিক আমার সামনে এনে দিয়েছিলেন। পণ্ডশ্রম! প্রথম দিকে ভদ্রলোক একটু যেন বিস্মিত হয়েছিলেন, পরে দস্তুর মতো বিরক্তই হয়ে উঠেছিলেন। কোনো লাভই হ'ল না! যা খুঁজছিলাম তা পাওয়া গেল না। শেষ খণ্ডটাকে সামনে গোছানো লম্বা দুসারি বই-এর মধ্যে যথাস্থানে রেখে দিলাম। 'সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী'—সোনালি জলে মোটা অক্ষরে লেখা এই শব্দ দুটো যেন আমাকে—আমার সমস্ত প্রয়াসকে—বিদ্রূপ করছিল। সামনের ষাট খণ্ড বই-ই ঘুরে-ফিরে দেখা হয়ে গিয়েছে।

এই বিরাট লেখকের সব বইগুলিই এর মধ্যে আছে তো? ভাল ক'রেই জানতাম, আর কিছুর না হোক তাঁর কয়েকটা গল্পের হদিস্ আমরা হারিয়েছি। একটা দৈব উল্লাস—যাকে আমরা প্রেরণা বলি—তার বশে সেগুলো তিনি রচনা করেছিলেন—কখনো কখনো ছদ্মনামে,—তারপর ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

সম্মুখে বিছানো সংবাদপত্রের দিকে চিন্তিতভাবে একবার চেয়ে দেখলাম, বড় বড় অক্ষরে উপন্যাসটার নাম লেখা রয়েছে, 'লেখাচোর'। আর নিচেই

তার চেয়ে একটু ছোট হরফে দেওয়া আছে গ্রন্থকারের নাম—অনোর-দ্য ব্যাল্‌জাক্। উপন্যাস খানার শেষ পঙ্‌ক্তির নিচে এক কোণ ঘেঁসে আরো ছোট হরফে লেখা, 'ক. ম কর্তৃক ফরাসী হইতে অনূদিত।'

অনুবাদকটী কে? ক ম আবার কার নাম? কোন্ পুরাণো বই-এ, কোন্ জীর্ণ হলদেটে ফরাসী কাগজে ব্যাল্‌জাকের ঐ উপন্যাসখানা তিনি পেয়েছেন? বহুদিন এটার কেউ খবর রাখেনি, হঠাৎ পুনর্প্রকাশ হয়ে গেল! এটাও কি সম্ভব—দুনিয়ায় কেউ যার সম্বন্ধে জানতো না এমন একটা পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে এসে পড়েছিল? তাও কি হয়?

নাঃ, সেটা সম্ভব ব'লে মনে হয় না। হ'লে, লোকটী নিশ্চয় এমন মহামূল্য বস্তুটীকে জার্মানির মফঃস্বল সহরের এই অখ্যাত কাগজে না ছাপিয়ে নগদ মূল্যেই বিক্রী করতেন। বিশেষ, দেখছি এ-লেখাটার সঙ্গে কোনো রকম মুখবন্ধ বা ভূমিকা জোড়া নাই। হয়তো বইখানার ফরাসী নামটা এর জার্মান নামের মোটেই অনুরূপ নয়। ক. ম ভদ্রলোক হয়তো তাঁর খুসীমতো এ নামটী পছন্দ ক'রে নিয়েছেন।

এই রকম একটা ধারণার বশে এই উপন্যাসটীর সঙ্গে ব্যাল্‌জাকের যতগুলি উপন্যাসের সংযোগ থাকা সম্ভব ব'লে মনে হয়েছে, সে-সমস্তর প্রথম পঙ্‌ক্তিগুলো তুলনা ক'রে দেখা গেল, একটাও মেলে না। গবেষণার সুবিধার জন্যে এ-উপন্যাসের প্রথম বাক্যটী মনে মনে ফরাসী ভাষায় পুনরনুবাদ ক'রেও দেখলাম। প্রথম বাক্যের পর দ্বিতীয় বাক্য, দ্বিতীয়ের পর তৃতীয়, আপনা থেকেই অনুবাদ হয়ে চলে, অনুবাদ করাটা আমার কাছে এতই সহজ বোধ হচ্ছিল যে, থামাটাই যেন দুরূহ হয়ে পড়ছিল। এ এক তাজ্জব ব্যাপার! এ-থেকে বুঝতে পারছিলাম, এই জার্মান অনুবাদটী সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছে। যখনই জার্মান বাক্যগুলোর ফাঁকে ফাঁকে মূল ভাষার আমেজ পাচ্ছিলাম তখনই পুনরনুবাদ করাটা শক্ত বোধ হচ্ছিল। এ-এক অদ্ভুত কারিগরী—ভাষার উপর

অধিকারের চরম পরিচয়। লিখনভঙ্গীর বিশুদ্ধতার উপর এই একাগ্র দৃষ্টি মোটেই সামান্য কথা নয়। লিখনভঙ্গীর সম্বন্ধে কি সহজ সূক্ষ্মানুভূতি নিয়ে, জার্মান ভাষাটাকে কি রকম সহজ ও সাবলীল ভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে এই অনুবাদক তাঁর কাজ ক'রে গিয়েছেন। অথচ লেখকটী বিনয়বশে নিজের পরিচয়টুকু পর্যন্ত রেখেছেন গোপন ক'রে।

যত ভাবি, প্রশ্নটা ততই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। সরকারী কাজ ফাঁকি দিয়ে দু-দুটো সকাল এই সহরে ব'সে ইতিমধ্যে নষ্ট ক'রেছি। স্থির করলাম, দুপুরটাও যাক্‌। ব্যাপারটা জানতে হবে।

এর দু-ঘণ্টা পর, আমি একটা ছোট্ট সম্পাদকীয় কক্ষে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সম্মুখে বসে। এই বুঝি পকেট থেকে পাণ্ডুলিপি বার করে— এই ভয়ে তিনি সশঙ্কভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। আমি তাঁকে অবিলম্বে সে বিষয়ে আশ্বস্ত ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁদের যে-লেখকটী আমার কৌতূহল উদ্রেক করেছেন তাঁর পরিচয়। শুনে তিনি বিস্মিত হলেন, আমাকেও বেশ একটু বিস্মিত করলেন তিনি—তাঁর নাম বলে': ক্যারোলিন্ মেয়ার।

ঠিকানা জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, এই সহরেই তিনি থাকেন, তবে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে কোনো ফল নাই। বৃদ্ধা এখন রোগশয্যায়—শোথ্‌-এ ভুগছেন,—মৃত্যুর বড় দেরী নাই। সম্পাদক মশাই বেশ একটু দরদের সুরে ব'লে চললেন—বৃদ্ধা তাঁর কাগজের খুব নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। ভাবখানা, যেন তিনি ম'রেই গিয়েছেন। "আমাদের সাহিত্যের চিরবিস্মৃত রত্নগুলো পুনরুদ্ধার ক'রতে তাঁর আর জুড়ি ছিল না।"

"বুঝতেই পারছেন, আমাদের কাগজটা আন্তর্জাতিক নয়, কাজেই আমাদের রবিবাসরীয় সংখ্যা—ঐ যে আপনার হাতে যেটা রয়েছে—ওটা ভর্তি করতে হয় এই সমস্ত লেখা দিয়ে। এর জন্যে আমাদের কোনো খরচা পড়ে

না, অথচ পাঠকদের মধ্যে যাঁরা জহুরী তাঁদের মনস্তুষ্টি হয়। শ্রীযুক্তা মেয়ারের উপর এবিষয়ে বরাবর নির্ভর ক'রে এসেছি। তাঁর বিরাট সাহিত্য-জ্ঞান এবং অপ্রকাশিত রচনাদির সম্বন্ধে সহজ দক্ষতার দৌলতে আমরা তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য বিগতাত্মা লেখকের—তাঁদের অনেকেই জগদ্বিখ্যাত—গদ্যরচনাব নানা উদ্ধৃতি পেয়েছি। চমৎকাব পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে সেগুলি নকল ক'বে তিনি আমাদেব আফিসে এনে দিয়েছেন। এইভাবে আমরা পাঠকদের উপহাব দিতে পেবেছি কত উদ্ধৃতি—কত জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী,—অল্পপবিচিত বিস্মৃত কত চমৎকাব বচনা—ডিকেন্স্, ভল্‌তেয়াব, ব্যাল্‌জাক, তুর্গেনিভ্-এব গ্রন্থ থেকে, কত বড বড লেখকেব দিনপঞ্জী থেকে, গ্যেটে শিলাব ক্লাইস্ট হেগেল প্রভৃতি মনীষীদেব পত্রাবলী থেকে। বড বড গ্রন্থকাবেব ছোট বড কত সব জ্ঞানসমৃদ্ধ বাক্য! শ্রীযুক্তা মেয়াবেব অক্লান্ত কর্মশক্তিব শেষ ফল ঐটি—ঐ—যাতে আপনি এত আকৃষ্ট হয়েছেন। এখানি তাঁব চাকবের হাত দিয়ে পাঠানো। এটিব সঙ্গে এসেছিল—আমাকে লেখা কয়েকছত্র একটা চিঠি। জানিয়েছিলেন, তাঁব শাবীবিক অবস্থা খুব খাবাপ—মৃত্যুব জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা কবছেন, তাঁর দুটী অন্তিম ইচ্ছা আমি যেন পূর্ণ কবি :—পবেব রবিবাবেই যেন তাঁব শেষ দান, ব্যাল্‌জাকেব এই 'লেখা-চোব' উপন্যাসখানা প্রকাশ করি, আব শেষ পঙ্‌ক্তিব নিচে এই কথাগুলো খুব ছোট হবফে ছাপিয়ে দিই, "ক ম কর্ত্তৃক ফরাসী হইতে অনূদিত'।"

ভদ্রলোক একটু আত্মপ্রসাদেব সঙ্গেই ব'লে চললেন, "দেখছেন, আমি তাঁর দুটী ইচ্ছাই অক্ষবে অক্ষরে পালন কবেছি। শ্রীযুক্তা মেয়াবেব আসন্ন মৃত্যুব জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত। তাঁব স্থান পূরণ করবাব মতো আর কাউকে পাওয়া যাবে ব'লে বিশ্বাস হয় না।"

এইখানটায় তাঁর কণ্ঠস্বর বদলে গেল, নাকী কান্না থামলো, ব্যবসায়ীর সুব এল। শেল্-ফ্রেমের চশমার ভিতব থেকে তাঁর চোখ দুটো আমার উপর ন্যস্ত

করলেন। ভাবটা, আমাকেই যেন তাঁর শূন্য স্থানটা পূরণ করবার দায়িত্ব নিতে হবে।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রীযুক্তা মেয়ারেব ঠিকানাটা টুকে নিলাম, বিদায় নেবার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, এই শ্রদ্ধেয়া মহিলাটী তাঁর শেষ লেখাটী ছাড়া অন্য কোনো লেখাতে তাঁব নামেব আদ্যাক্ষবগুলোও প্রকাশ কবেন নি কেন? লেখাব জন্যে কোনো পাবিশ্রমিকই বা নেননি কেন? সম্পাদক-প্রবব আমার প্রশ্ন শুনে আকাশ থেকে পডলেন: "কোনো দিন তো উনি তাঁব নাম প্রকাশ করতে আমাদেব বলেন নি। লেখাব জন্যে কোনো পারিশ্রমিক তিনি তো কখনো চান নি।"

বুঝলাম। ঠোঁটের আগায় একটা জবাব এসে পডেছিল, সেটা চেপে গিয়ে তাডাতাডি রাস্তায় বেবিয়ে পডলাম।

হোটেলের কামরায় ফিরে আবার ব্যাল্‌জাকেব উপন্যাস নিয়ে বসলাম। বছব কয় আগে, ব্যাল্‌জাকেব কয়েকখানা উপন্যাসেব অনুবাদ কবেছি পবম উৎসাহের সঙ্গে, এ-অনুবাদকেব লিখনভঙ্গী বা উৎকর্ষ বিচাব কববাব সামর্থ্য কি আমার নাই? দ্বিতীয়বাব সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা ক'বে পূর্ব মত দৃঢতব হ'ল,— এ অনুবাদের অতুলনীয় মূলানুগত্য বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশমাত্র নাই, জার্মান বুদ্ধিজীবীদেব মধ্যে এ রকম প্রতিভা সত্যিই খুব বিরল। বডই দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্তা মেয়ারের অসুস্থতার জন্যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করাটা সম্ভব হ'ল না।

'টাগব্লাট্‌' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের ধাবণা:—প্রতিভাব জন্ম নিঃশেষে শোষিত হবার জন্যে। এই মহাপুরুষটীর পক্ষে মোটেই শুভ নয়, এমনি একটা নীরব সঙ্কল্প এঁটে নিয়ে আমি আমার নিয়মিত কাজে মন দিলাম।

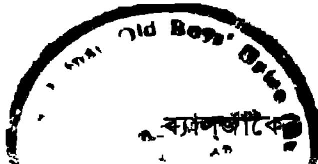
কয়েকদিন পর, হাতের কাজ অনেকটা হাল্কা হ'ল। বাডী ফিরবার সময় এল। বাড়ীতে পৌঁছে, সঙ্গে-আনা কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে গিয়ে সেই

পত্রিকাখানি আমার নজরে পড়ল। হঠাৎ স্মরণ হ'ল, আমার কাগজপত্রের মধ্যে কোথায় যেন ব্যাল্‌জাকের সমস্ত বইএর একটা তালিকা টোকা আছে—শেষ বয়সের লেখাগুলোর পর্যন্ত। কোনো সন্দেহ নাই যে, আমি ব্যাল্‌জাকের যে পুরাণো সংস্করণটা দেখে এসেছি, এটা তার চেয়ে অধিক সম্পূর্ণ। একটু খুঁজতেই কাগজটা পাওয়া গেল। এ তালিকাটাতেও কিন্তু 'লেখা-চোর' উপন্যাসের কোনো হদিস্‌ মিললো না।

আশ্চর্য। শ্রীযুক্তা মেয়ার যদি এখনো বেঁচে থাকেন,—হয়তো তিনি কতকটা সেরে উঠেছেন, হয়তো 'টাগ্‌ব্লাট্‌' পত্রিকায় আবার লেখাও দিচ্ছেন। তাঁকে একখানা চিঠি লিখবো, স্থির করলাম। হয়তো তিনি উত্তর দিতে পারবেন। হয়তো আমার চিঠিটা তাঁর জীবনের শেষ ক্ষণটীকে একটু আনন্দোজ্জ্বল ক'রে তুলবে। এ চিঠি যখন পৌঁছুবে হয়তো তিনি তখন পরলোকে। সেক্ষেত্রে চিঠিটা ফেরৎ আসবে, চিঠির পিছনে আমার নাম আর ঠিকানাটা লিখে দিলেই হ'ল।

ডেস্কে ব'সে লিখতে সুরু করলাম,—দীর্ঘ পত্র—রোগীকে যে রকম পত্র লেখে, মৃতের কাছে যেমন ক'রে লোকে মনোভাব নিবেদন করবার চেষ্টা করে চিঠির মধ্য দিয়ে। লিখ্‌লাম, কেমন ক'রে তাঁর নাম ও পেশা আমি জানতে পেরেছি। অনেক ফরাসী লেখকের—বিশেষ ক'রে ব্যাল্‌জাকের অনুবাদক হিসাবে তাঁর সঙ্গে আমার একটা যোগসূত্র আছে এ-কথাটার উপর বিশেষ জোর দিলাম। তাঁকে জানালাম, জার্মান ভাষার বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে ইতিপূর্বে তাঁর মতো এমন অনুবাদ কেউ করেনি, যদিচ অনুবাদ হচ্ছে এমনি একটা জিনিস যাতে নাকি আনাড়ির ভাসা-ভাসা লেখাও নির্বিবাদে গ্রাহ্য হয়ে যায়,—তার অগভীরতা প্রায়ই ধরা পড়ে না।

লিখলাম, "অত্যন্ত বিস্মিত হলাম যে, এমন অসাধারণ প্রতিভা সত্ত্বেও আপনি পারিশ্রমিক হিসাবে কখনো কিছু পান নি, একটা মফঃস্বল সহরের



নগণ্য পত্রে লেখা বাব করার অপেক্ষা অধিক কোনো খ্যাতি আপনি অর্জন করতে পারেন নি।"

চিঠিব শেষ দিকে শ্রীযুক্তা মেয়ারকে অনুরোধ জানালাম, স্বাস্থ্য প্রতিকূল না হ'লে তিনি যেন আমাকে জানান, ব্যাল্‌জাকের কোন্ গ্রন্থ থেকে 'লেখা-চোব' উপন্যাসটী গৃহীত হয়েছে। গ্রন্থখানা আমাব সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, জানতে পারলে এতাবৎকাল অপবিজ্ঞাত এই উপন্যাসখানার প্রতি আমি জনসাধাবণেব দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবো, যথাবিহিত সম্মানেব সঙ্গে এই অনুবাদেব সম্পর্কে তাঁর নাম প্রচার করাটা আমার কর্তব্য বিবেচনা করবো।

চিঠিটা একবাব প'ডে দেখলাম। বেশ সুস্পষ্ট ও সুসম্বদ্ধ হয়েছে। সহানুভূতি জানিয়ে দ্রুত ব্যাধি-মুক্তি কামনা ক'বে চিঠিটা শেষ করা গেল।

এক সপ্তাহেব উপর অতিবাহিত হ'ল। চিঠির কোনো উত্তর এল না। সেটা ফেরৎ-ও পেলাম না। বুঝলাম, শ্রীযুক্তা মেয়ার এখনও জীবিতা, সম্ভবতঃ উত্তব লিখবাব সামর্থ্য নাই। ব্যাল্‌জাক্-রচিত মূল 'লেখা-চোরে'র কোনো পাত্তা পাওয়াব ভরসা একরকম ছেড়ে দিয়েছি এমন সময় একদিন—সম্ভবতঃ সপ্তাহ চাবেক পবে—একটা মোটা লেফাফা পেলাম। দেখলাম, সেটাব পিছনে, ঈষৎ কম্পিত সুন্দব হস্তাক্ষবে লেখিকাব নাম দেওয়া রয়েছে : ক্যাবোলিন মেয়ার। তার নিচে—আর একজনের হস্তাক্ষরে একটা ক্রুশ চিহ্ন আব চিঠি ডাকে দেওয়ার তারিখ। চিঠি খোলার আগেই বোঝা গেল, শ্রীযুক্তা মেয়ার নিজেই এই চিঠি লিখেছেন, আর তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পবেই এটা ডাকে ছাড়া হয়েছে। ওই লম্বা ভাবী চিঠিটায় লেখা ছিল :—

মহাশয়,

আপনি আমায় পত্র দিয়ে ভুল করেন নি, আমি এখনও বেঁচে আছি, শ্বাস-প্রশ্বাস এখনও বন্ধ হয় নি। তবে বেঁচেই আছি মাত্র, নিঃশ্বাস নিচ্ছি টেনে টেনে, অতি কষ্টে। তবু আপনাব পত্রের উত্তর দেবার সামর্থ্য এখনও

যায় নি। চিঠিটা শেষ করতে হয়তো কয়েকদিন লাগবে। রোজ একটু একটু ক'রে লিখবো। শক্তি ফুরিয়ে এসেছে সত্যি, তবে আপনাকে চিঠি লিখে আমার নিজেব জীবন-কাহিনী শোনানো ছাড়া অন্য কাজও আমাব এ জগতে নাই। ওরই মধ্যে আপনার সমস্যার সমাধান পাবেন, আপনার পত্রেব মধ্যে যে-সব প্রশ্ন অনুক্ত রয়েছে সেগুলোরও।

পত্রের প্রথমেই লিখেছি, আপনি আমায় পত্র দিয়ে ঠিকই কবেছেন। ঐ সঙ্গে এ-কথাটাও যোগ করতে চাই: আপনি ভাল কবেছেন। হাঁ, দুনিয়া হ'তে বিদায় নেবার সময়—জীবনে এই যেন প্রথম উপকার পেলাম। আপনাব চিঠির মধ্যে দিয়ে সমস্ত জগৎ যেন আমাকে সম্ভাষণ কবছে—যে-জগৎ জীবনভোব আমার চারপাশে পাষাণের মতো মূক হয়ে ছিল।

বহুদিন পূর্বেকার কথা। বয়স তখন অল্প ছিল। মনে হ'ত আমাব চারপাশের জগৎকে কত কথাই না শোনাতে পারি। বাবা শিক্ষকতা কবতেন, অল্প বয়সেই তিনি মাবা যান। তাঁব কাছ হ'তে উত্তবাধিকারসূত্রে পেয়েছিলাম পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ লেখকদেব গ্রন্থবাজি। আমাব জন্মেব সময় পর্যন্ত নূতন নূতন গ্রন্থ কিনে তিনি তাঁব গ্রন্থাগাব সমৃদ্ধ কবেছিলেন। গৃহকর্ম সমাপ্ত হ'লে রুগ্না মায়ের সেবার ফাঁকে ফাঁকে অবকাশ পেলেই আমি এই গ্রন্থরাজ্যে ছুটে আসতাম।

পঁচিশ বছর বয়সে মাকেও হাবালাম। আমি একেবারে একা প'ড়ে গেলাম। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার অভ্যাস না থাকায়, লাজুক স্বভাবের জন্যে, একান্তভাবে আমার প্রিয় গ্রন্থগুলোর শরণ নিলাম, সান্ত্বনাও পেলাম। প্রথম দিকটায় মধ্যে মধ্যে গ্রন্থাগাবটা কালোপযোগী কববাব জন্যে নূতন প্রকাশিত পুস্তকও কিনবাব চেষ্টা করতাম। তার জন্যে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় হয়ে যেত। বৃথাই! আমার উপর যে গ্রন্থ যত প্রাচীন, তাব প্রভাব তত বেশি হয়ে পড়েছিল। এমনি গভীরভাবে যে 'তখন' আব

'এখন'-এর মধ্যে সর্বদেশে সর্বকালে যে ব্যবধান দেখা যায় তা পূর্ণ করার আমি কোনো উপায়ই উদ্ভাবন করতে পারলাম না। এ বিষয়ে সজাগ হতেও আমার অনেক সময় লেগেছিল। আধুনিক সাহিত্য আমার কাছে অসহ্য বোধ হ'ত, স্বপ্নলোকের রহস্যের মধ্যে আরও গভীরভাবে ডুব না দিয়ে আমি মোটেই সোয়াস্তি পেতাম না।

কিন্তু এই সময় স্বয়ং মানবসমাজকে সম্ভাষণ করবার একটা দুরন্ত কামনা আমার মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠলো। প্রথম প্রথম কবিতার মধ্যে দিয়ে অন্তরের এ ব্যাকুলতা প্রকাশ করতাম, তারপর কথিকা লিখবার চেষ্টা করলাম, শেষ পর্যন্ত একখানা উপন্যাস।

যা লিখতাম লেখনী হতে সহজেই উৎসারিত হ'ত। নিজেকে এমনিভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার যে কি আনন্দ! জীবনে সবচেয়ে ভালো কেটেছিল সেই দিনগুলো। এ-ভাবটা বেশি দিন স্থায়ী হ'ল না। এখন নতুন একটা খেয়াল ঘাড়ে চেপে বসলো রোখ চাপলো, দুরন্ত রোখ। মোদ্দা, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম প্রকাশ করতে চাইলাম।

যাঁরা আমার আদর্শ ছিলেন তাঁদের পুষ্পিত কাননের বাছাই-করা ফুল দিয়ে যখন এই সরল কামনাটিকে মাল্যভূষিত করতাম, তখন তার অর্থ বুঝিনি। আজ সে সব কথা বোঝা অনেক সহজ হয়েছে। বিশেষ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন আমায় সংক্ষেপে বলতে হবে। একজন পুস্তকবিক্রেতার কাছ থেকে কয়েকজন প্রকাশকের ঠিকানা নিয়ে আমার পাণ্ডুলিপিগুলো পাঠিয়ে দিলাম—বিশাল জগতে। ফল হ'ল মর্মান্তিক। কয়েকখানা ফেরৎ এল, সঙ্গে ছোট্ট একটুখানি ক'রে চিঠি: "দুঃখিত, এটা আমাদের কাজে লাগবে না।" অন্যগুলো অনেক ঠোক্কর খেয়ে কোনো উত্তর না নিয়েই ফিরে এল। একটা বইও প্রকাশকদের মনোনীত হ'ল না।

আঘাত পেলাম, কিন্তু দমলাম না। অল্পকাল মধ্যেই মনে হ'ল, আমার

লিখনভঙ্গী কাঁচা, বড় বড় লেখকরা যে উচ্চ আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস ক'রে অমর হয়েছেন, মোটেই তার যোগ্য নয়। আবার আমার চিরপ্রিয় পুরাণো লেখকদের রচনার মধ্যে ডুব দিলাম, তাঁদের দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার করতে, তাঁদের লিখনভঙ্গী আয়ত্ত করতে।

আবার আমার লেখনী হতে নিঃসাবিত হ'ল কথিকা, প্রবন্ধ, কাহিনী। একবার একখানা রীতিমতো উপন্যাসও। দ্বিতীয় পৌষের প্রথম ফসলটা প্রথম পৌষফসলের অনুগামী হওয়ার পরেও এখানা বড় যত্নে, বড় বিশ্বাসেই রচনা করেছিলাম। প্রকাশকদের কাছে, সম্পাদকদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম আবার ফেরৎ এল।

এতদিনে আমার লেখাগুলো ছাপার অক্ষরে দেখবার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে একটা দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয়েছিল। দুনিয়ার ভাব বুঝতে পারছিলাম না— কেন আমার প্রতি এই নির্মম ঔদাসীন্য। মরীয়া হয়ে, কোনো বিশেষজ্ঞের অভিমত নেওয়া স্থির করলাম। বাবার অনেক দিনের বন্ধু—কোনো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্যের একজন অধ্যাপকের কথা মনে পড়লো। বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি মা'র কাছে একখানা আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ পত্র দিয়েছিলেন। তাঁকেই লিখলাম। লিখবার সময় জানতাম না, তিনি বেঁচে আছেন কি না। তবু সাধারণ ভাবেই লিখলাম, যেন বেঁচে না থাকাটাই আশ্চর্য। বেঁচে তিনি সত্যিই ছিলেন।

কিছু দিন পর, তাঁর কাছ হতে আমার পাঠানো কাগজের মস্ত তাড়াটা ফিরে এল, সঙ্গে একখানা দীর্ঘ পত্র। সেখানা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেললাম। পড়তে পড়তে বুক আমার ভেঙে যাচ্ছিল। বোধহয় হাজার বার পড়লাম। এরই যেন প্রতীক্ষা করছিলাম। এ যে আমার মৃত্যুদণ্ড! আজও, এতকাল পরেও, এ ছাড়া অন্য নাম সেটাকে দিতে পারি না। তিনি আমার স্বপ্নলোক ভেঙে দিলেন। পরিবর্তে কিছুই পেলাম না।

বৃদ্ধ অধ্যাপক পিতৃ-সুলভ স্নেহের ভাবে লিখেছিলেন, "তোমার জীবন-কাহিনী, রুচি-অরুচি প্রভৃতি থেকে আমার পুরাণো বন্ধুর আত্মজার পরিচয় পেলাম। এই কারণে, অবশ্য তুমি বিশেষ ক'রে আমাকে অনুরোধ করেছ ব'লেও, তোমার লেখার সম্বন্ধে আমার সুস্পষ্ট মতামত—সম্পূর্ণ সত্যটা—প্রকাশ করবো। অন্যভাবে বলা সম্ভব নয় ব'লেই কথাটা এভাবে বলতে হচ্ছে:—তুমি তোমার জীবন-ধারার নাগপাশে বদ্ধ হয়েছ, পুরাণো গ্রন্থকারদের মোহে একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছ। নিজে লিখতে গিয়ে তাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠা তোমার পক্ষে স্পষ্টই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অমর সাহিত্যকে মূল-মন্ত্র করা মোটেই ঠিক নয়। তোমার কি মনে হয় আইকেনডর্ফের মতো কোনো লেখক এই ১৮২৬ সালেও তাঁর 'অপদার্থের' মতো একখানা বই লিখতেন,—ওই রকম ধাঁচে? কোনো অমর সাহিত্যের রস গ্রহণ করার অর্থ তো সেটার ভিন্নযুগীয়তা ভুলে যাওয়া নয়। বস্তুতঃ কোনো মহৎ গ্রন্থই তার প্রথম প্রকাশের তারিখটার সূচনা না দিয়ে ছাপা হওয়া উচিত নয়। যদি কোনো সমালোচক কোনো পুস্তককে, সেটা প্রকাশ হবার ত্রিশ কি পঞ্চাশ বছর আগেকার জনসাধারণেরই উপযুক্ত মনে করতে একান্তই বাধ্য হয়, তা'হলে সেটা লেখা 'পণ্ডশ্রম' ছাড়া আর কি? "হায়রে হায়! এর মধ্যে যে দু'পুরুষ কেটে গিয়েছে!"—এমনি একটা নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে অধ্যাপক মশায় তাঁর সমালোচনা শেষ করেছিলেন, এর পরে দু'একটা সান্ত্বনার কথা বা শুভ-কামনা যে না ছিল এমন নয়।

প্রাচীন গ্রন্থকারদের উপর আমার যে প্রেম সেটা অক্ষুণ্ণ রেখে, তাদের মধ্যে যে সাধনা ও সিদ্ধির পরিচয় রয়েছে সেটা লাভ করবার সর্বপ্রকার প্রয়াস আমাকে ত্যাগ করতে হবে! এক কথায়, তাঁদের আদর্শলোকে আমায় আরও গভীরভাবে, অধিকতর বিনয়ের সঙ্গে প্রবেশ করতে হবে, যাতে তাঁদের অন্তরতম আত্মা আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হতে পারে কিন্তু সে উদ্‌ঘাটন শুধু আমারই কাছে হওয়া চাই।

'শুধু আমার কাছে!' অধ্যাপকের বক্তব্য বেশ বুঝলাম। লেখা আমায় বন্ধ করতে হবে। সে যে অসম্ভব!

কিন্তু এই কি সত্যি? নিশ্চয়ই নয়। আমি খুব ভাল ক'রে জানতাম, আমার দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছিল, আমার মধ্যে দৈবী প্রেরণা আছে, যার বলে আমি মানুষকে সম্ভাষণ করতে পারি, তার অন্তরকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করতে পারি, মথিত করতে পারি। একটা বিষয়ে অবশ্য অধ্যাপক ঠিকই বলেছিলেন: আমার অন্তরস্থ পবিত্র এষণাগ্নি বিগত কালের লেখকদের দুষ্ট প্রভাবে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। ছেলেবেলাকার এ-অভ্যাস আর কাটিয়ে উঠতে পারবো না। সেটাও ভাল ক'রেই জানতাম।

সত্যিই কি তা'হলে আমায় লেখা বন্ধ করতে হবে? অন্য ভঙ্গীতে লেখা তো আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তা একবার প'ড়ে নিলাম। অসুখ বাড়ায় সমস্ত সপ্তাহটা কিছুই লিখতে পারি নি। আজকে, হয়তো অল্প সময়ের জন্যে, একটু ভাল বোধ হচ্ছে। সংক্ষেপে বলতে চেয়েছিলাম, অনেক ব'কে ফেলেছি। তবু বক্তব্য বিষয় খাপছাড়া ভাবেই নিবদ্ধ হ'ল।

এর পর থেকেই আমার দুরদৃষ্টের আরম্ভ। ঐ দিনের পর হতে আজ পর্যন্ত আমার জীবনের ধারা কোন্ প্রণালীতে বয়েছে, তার কোনো আভাষ এ পর্যন্ত দিই নি। দীর্ঘ একটানা প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার প্রণালী ধ'রে।

সুরু হয়েছিল কৌতুকচ্ছলে। প্রাচীন কালের বড় বড় মনীষীদের বিরুদ্ধে সে যেন একটা ছেলেমানুষী বিদ্রোহ কেন তাঁরা আমার সর্বনাশ করলেন? অধ্যাপক মশায় আমার প্রতিখানি পাণ্ডুলিপির ওপর লাল পেন্সিলে লিখে দিয়েছিলেন—সেটা লিখবার সময় কোন্ বড় লেখকের ভূত আমার হস্তে ভর করেছিলেন। কোনটায় 'ব্যাল্‌জাক' কোনটায় 'তুর্গেনিভ্' 'গ্যেটে', 'ক্লাইষ্ট'। লেখাগুলো ভাল ক'রে প'ড়ে অস্বীকার

করতে পাবলাম না, বৃদ্ধ ভুল করেন নি। কল্পনায় আমি পড়তে লাগলাম, আমার সমাপ্ত বা পরিকল্পিত কোন রচনার শীর্ষে কোন বড় লেখকের নাম থাকা উচিত। নিজের রচনার ভাব ও ভঙ্গীতে সেই সব বড় লেখকদের কতখানি অনুকরণ কবতে পেবেছি তা দেখে একটা তিক্ত আমোদ বোধ হ'ত।

প্রায় ঐ সময়ে আমাদের 'টাগব্লাট' কাগজের প্রথম সম্পাদক—এঁর সঙ্গে আমার একটু পরিচয় ছিল—তাঁর পরিকল্পিত রবিবাসরীয় সংখ্যার জন্যে আমাদেব প্রাচীন সাহিত্য থেকে অল্প পরিচিত বা বিস্মৃত কিছু কিছু রচনা সংগ্রহ ক'বে দিতে আমাকে অনুরোধ করলেন। চয়নের ভার রইলো আমাব উপব, রাজনীতি বা ব্যবসায় সম্প্‌ক্ত বড় বড় সমস্যার বিচারে ছিল তাঁর নিজেব অভিরুচি। চট ক'রে আমি সঙ্কল্প ক'রে নিলাম। আমার ব্যগ্র সম্মতি দেখে তিনি সরল মনে খুসি হয়ে উঠলেন। মৃত্যু পর্যন্ত বেচারীব ভুল ভাঙে নাই।

একটা উপন্যাস লিখলাম,—'ব্যাল্‌জাক বিরচিত'। লেখাটা যখন দফায় দফায় পাঠিয়ে দিতাম, মনে হ'ত যাঁদের ভূত আমায় পেয়ে বসেছে, পাশবদ্ধ করেছে তাঁদেব একজনের উপর খুব একচোট শোধ তুলে নিচ্ছি।

উপন্যাসটা বের হবার আগের ক'টা দিন অবশ্য ছটফট করে কাটাতে হয়েছে। বারেবারে ভেবেছি, পাণ্ডুলিপি ফেরৎ চেয়ে নিই। বারেবারে অভিমানে বেধেছে, ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমায় বিবত করেছে। নইলে যে আমার পূর্বেকার সমস্ত রচনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

একদিন হঠাৎ সম্পাদকের আফিসে আমার ডাক পড়লো। ভয়ে আধমরা হয়ে তাঁর কাছে গেলাম। ভেবেছিলাম, ধরা প'ড়ে গিয়েছি। নাঃ, তা নয়। প্রুফ্‌ রীডার আসে নি, কম্পোজিটার এক ফালি ভিজে কাগজ এনে দিল আমার হাতে, বললো, ভুল থাকলে যেন শুধরে দিই। তখন আমার গর্বই বোধ হ'ল। হাঁ, গর্বই। সাফল্যের প্রথম নিদর্শন কম্পিত হস্তে ধারণ ক'রে নবিশের যে

গর্ব জন্মায়, সেই গর্ব। যত্ন ক'রে ভুল সংশোধন করলাম। যা হয় হোক্—ব'লে গা ঢেলে দিলাম। মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি নেমে এল। এপথে প্রথমে পা দিয়েই যে সমস্ত সম্ভাবনা চোখে পড়লো, ভাল ক'রে সেগুলো আলোচনা ক'রে নিলাম। অসংখ্য সম্ভাবনা! কাজ ক'রে চললাম—হাঁ, একথা বলবার অধিকার আমার আছে, এটা যে আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগও,—কাজ ক'রে চললাম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, সযত্নে। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন: সৃষ্টির সঙ্গে যোগ করলাম সার্থক চাতুর্য। এক একজন প্রাচীন লেখককে আদর্শ নিয়ে তাঁকে পুনর্জীবিত ক'রে তুলতাম। মধ্যে মধ্যে মনে হ'ত, তিনিই যেন আমার টেবিলের উপর লিখে যাচ্ছেন আর আমি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে তাই দেখছি। তাঁকে অনুপ্রাণিত করছি। সে সব লেখা আমার।

ডিকেন্স থেকে নিলাম—শুধু তাঁর নামটা নয় তাঁর জাঁকালো দীর্ঘ-বাক্য রচনাভঙ্গী। আমাদের বসরাজ প্রেজার-এর হয়ে চাটিম্ চাটিম্ বুলি ভাঁজলাম। হেকেল যে-সব চিঠি লিখলেও লিখতে পারতেন, সেগুলি স্বকপোল হতে সযত্নে উদ্ধার করলাম। এই সমস্ত বড় লোকদের মুখ দিয়ে বা'র করা গেল কত বক্তৃতা, অন্য প্রাচীন লেখকদের সম্পর্কে তাঁদের রুচি অরুচির কথা, তখনকার বিবিধ ঘটনার সম্বন্ধে তাঁদের মতামত। কিছুদিনের মধ্যেই হাত পাকা হয়ে গেল, অনুত্তেজিতভাবে, শান্ত হয়ে, নিজের কল্পনার ঊর্ধ্ববিহার লক্ষ্য করতে লাগলাম। আমাদের সহরের স্কুলে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বুড়ো গ্যেটের মুখে আমি যে উক্তি আরোপ করেছিলাম, তার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ রচনা করতে দেওয়া হ'ল, দেখলাম। এই স্কুল থেকে উত্তীর্ণ এক ছোকরা-সাহিত্যিক ভলতেয়ার-এর বহু উক্তি তুলে একটা প্রবন্ধ লিখে ফেললো,—উক্তিগুলোর বেশির ভাগ আমারই উদ্ভাবিত।

আরও লিখতে পারতাম, কিন্তু সময় নাই। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। পূর্ণসত্যের অনুরোধে আর একটী মাত্র কথা বলা প্রয়োজন।

আমাব স্বরূপ কেউ চেনে নি, কখনো ধরা পডিনি। ধবা পডাটা যেন কতবাব আমি নিজেই কামনা কবেছি তাব প্রতীক্ষা কবেছি। ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু ব্যক্ত কবতে চাই না। আমি যেন আব কেউ হয়ে পডেছিলাম, একসঙ্গে শতটা জীবন যাপন কবেছি—তার একটাও আমাব নিজের ছিল না।

আপনি জানেন, লেখার জন্যে আমি কখনো কোনো দক্ষিণা নিই নাই। তবু কেন লিখে গিয়েছি সে কথা এখন আর পবিষ্কাব ক'বে বলা বাহুল্য হবে। আমাব নামটাও অবশ্য ববাবব অজ্ঞাত বেখেছিলাম। শেষ বচনাটীতে কেবল নিজেব নামেব আদ্যাক্ষব দুটী প্রকাশ কবেছি। কেউ অবশ্য এটা টেব পাবে না। এবাবে নাম দেওয়াতে আমাব কোনো অন্যায হয়নি। গল্পটা একাধিক অর্থে আমাবই। এতক্ষণ যা পডলেন তা হতেই বোধহয় আপনি বুঝে থাকবেন, 'লেখা-চোব'খানা ব্যাল্‌জাক্ লেখেন নাই—ওটা আমাবই জীবনেব নিবলঙ্কাব বিবৃতি মাত্র আমাব এই প্রবঞ্চক জীবনেব।

হাঁ, আমিই এই 'লেখা-চোব'। একথা সত্যি, বড লেখকদেব এক নাম ছাডা, কখনো কিছু চুবি কবিনি, যে-গর্বোন্নত দৃষ্টিতে এই দুনিয়াকে দেখেছি সেটা ছাডা তাঁদের কাছে আর কিছুর জন্যেই আমি ঋণী নই।

আপনাব প্রশ্নেব উত্তর দেওয়া হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন কবেছিলেন ব'লে আপনাকে ধন্যবাদ। আমার জীবনেব এই গোধূলি-লগ্নে অন্ততঃ একজন মানুষকে এই জীবনটা বোঝাবাব অবকাশ পাওয়া গেল। প্রশ্নটা তুলে যে অবকাশ আপনি দিয়েছেন, সেই জন্যেই ধন্যবাদ। 'লেখা-চোর' বইখানাব ব্যাপারে আপনি যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, আমার রচনাভঙ্গীর চমৎকাবিতা সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করেছেন, তাতে মনে হয়েছে আপনি হয়তো আমাব স্বরূপ বুঝবেন।

এখন আর সময় নাই। মৃত্যু আমাকে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দেবে না। এখনই অবশ্য একটু ভালোর দিকেই আছি, তাই এ-পত্র শেষ করা সম্ভব হ'ল। তবু জানি, আমার এই ভালো-থাকা কত অনিশ্চিত। আমার বা আমার ডাক্তারের এ বিষয়ে কোনো মোহ নাই। দিন গোণাগুণ্‌তি হয়ে এসেছে। এবার চিঠি শেষ ক'রে শিল-মোহর করা সেরে রাখতে হবে।

মৃত্যুর দিনের তারিখ দিয়ে এটা যেন ডাকে দেওয়া হয়,—ব'লে রাখলাম। কাজেই, বুঝছেন, আপনার সঙ্গে কথা কইছেন এক মৃতা নারী। জীবিত কালে যে সুন্দর সহানুভূতি আপনার কাছ থেকে পেয়ে গেলাম, এখনও তার কিঞ্চিৎ হতে যেন বঞ্চিত না হই পারেন যদি, আমার মৃত্যুর পরে সেটা নিবেদন করবেন।—ক্যারোলিন মেয়ার। *

* অষ্ট্রিয়ান গল্প :—কাউণ্ট ঠুন্ হোহেন্‌ষ্টাইন

—অদমনীয়—

রুমানিয়ার জেলগুলো যেন জ্যান্ত মানুষের গোরস্থান। সেগুলোর ভিতর যেসব কাণ্ড ঘটে, আমি জানি। তারই তদন্ত করতে আমি রুমানিয়ায় গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ করেছি, তাদের চিঠি পেয়েছি, বল্‌সেভিজমের জন্যে দণ্ডিত বা 'সন্দেহক্রমে ধৃত' রাজনৈতিক বন্দীদের ডফ্‌টানা, যিলাভা, ভাকারেষ্টি প্রভৃতি যেসব জায়গায় রেখে ধীরে ধীরে মেরে ফেলা হয়, সেই সব অতি আধুনিক বর্বরতার অন্ধ গহ্বর থেকে বেরিয়ে-আসা অনেকের কাছে আমি এ সম্বন্ধে সন্ধান নিয়েছি।

অসংখ্য তথ্য পেয়েছি—সুস্পষ্ট, অনস্বীকার্য তথ্য। আমার চারপাশে ভিড় ক'রে তারা ব্যাকুল আগ্রহে ভাষা চাইছে।

এই তথ্যগুলোর একটা আজ আমি এখানে পেশ করবো—মাত্র একজনের কাহিনী।

জি, বুজোর ছিলেন রুমানিয়ান উকিল। রুশিয়ার উপর তাঁর আন্তরিক দরদ ছিল। বিশেষ ক'রে এইটেই হ'ল তাঁর বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভি-যোগ—তিনি ছিলেন রাকভ্‌স্কির খাস্‌মুন্সী। তা ছাড়া, রুমানিয়া যখন জোর ক'রে বেসারাবিয়া দখল করে, তিনি তার প্রতিবাদ করেছিলেন। নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা নিজেরা ক'রে নেবার যে স্বাভাবিক অধিকার মানুষের আছে, সেই অধিকারের এই অতি নির্লজ্জ অস্বীকৃতিকে, এই অদ্ভুত আন্তর্জাতিক দস্যুতাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি।

তাই, আজ ছ' বৎসর ধ'রে বুজোর ডফ্‌টানা জেলে বন্দী। ছ' বৎসর

কাল অবিবত শিকলপবা অবস্থায় ছোট্ট একটা 'সেলের' মধ্যে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে। সেলের মধ্যে আছে একটা কাষ্ঠশয্যা, হাতে পায়ে লোহার কড়ি প'বে তারই ওপর তিনি প'ড়ে থাকেন। ওই খানেই খাওয়া, ওই খানেই শোওয়া। হাতের নাগালের মধ্যে একটা প্যান্। সেইটেই একমাত্র আস্‌বাব, আজ চুয়াত্তব মাস এটা তাঁব সঙ্গে বয়েছে।

বুজোবকে ঘিবে একটা নিশ্ছিদ্র গোপনতাব লৌহপ্রাচীব খাড়া কবা হয়েছে। কারুব সাথে দেখা কবাব অনুমতি তাঁর নাই। জেলে ঢোকাব পব থেকে তাঁকে একজন মানুষেবও মুখ দেখ্‌তে দেওয়া হয় না, একজনেবও কণ্ঠস্বর শুন্‌তে দেওয়া হয না। পডা নিষেধ, লেখা নিষেধ। এই অন্ধগুহাব মধ্যে লেখাপডা সম্ভবও হ'ত না। এই সিন্দুকেব মধ্যে আলো প্রবেশেব পথ নাই। চব্বিশ ঘণ্টা অন্তব, জেলাব আসে, ভাবী দবজাটা একপাশে ঠেলে, গরাদেব ফাঁক দিয়ে জঘন্য লপ্সী বেখে যায়। সেটা তাঁব মহাভাগ্য। সে হাতটাও যদি কোনোদিন তিনি দেখে থাকেন। এমনি অন্ধকাব।

প্রথম প্রথম, একান্ত সংস্কাবের বশে তিনি জেলাবেব সঙ্গে কথা বলবাব চেষ্টা কবতেন, শুধু একটীবাব মানুষের গলা শুন্‌বাব জন্যে। মিথ্যে আশা। রুমানিয়ার মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীব কডা আদেশ, বুজোবেব সঙ্গে কারও কোনও বকম আলাপ চল্‌বে না।

মানুষকে মডার সামিল ক'বে, জ্যান্ত মানুষকে সমাধি দিয়ে, এই যে ভয়াবহ অত্যাচার চলেছে, এটাকে একটুকুও লঘু করবার কোনো চেষ্টাই সফল হয়নি। রুমানিয়ার শাসকদের জিঘাংসাবৃত্তি এব কমে তৃপ্ত হয় না। সোভিয়েট্ রুশিয়া বুজোরেব বিনিময়ে অন্য বন্দী দেবার প্রস্তাবও দিয়েছিল, রুমানিয়া রাজী হয়নি।

তবু, একদিন বুজোরের সঙ্গে দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে, তাঁর সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

একবার গুজব উঠলো, বুজোর মারা গিয়েছেন, আবাব গুজব উঠলো তিনি একেবাবেই পাগল হয়ে গিয়েছেন। ডফ্‌টানা জেল থেকে লেখা একজন বুড়ো কয়েদীব একখানা চিঠি আমি নিজের চক্ষে দেখেছি, তাতে লেখা ছিল—রাত্রে ঝড়জল না হ'লে, মাটীব নীচে থেকে মাঝে মাঝে কানে আসে, গানের গুন্‌গুনানিব একটা চাপা একঘেয়ে আওয়াজ। ও-ই বুজোব।

লেন্থ্‌ৎসা ফিলিপোভিচি ব'লে একজন অল্পবয়সী মজুবণী সঙ্কল্প কবলো, যেমন ক'বে হোক্ সে বুজোবের সঠিক সংবাদ জানবেই।

ভাগ্যক্রমে একটা সুযোগও মিলে গেল, 'তিনশ জনেব বিচাব' ব'লে বিখ্যাত বাজনৈতিক বিচাবেব শুনানির সময় সরকার পক্ষেব উকিল ঘোষণা করলো, অষ্টাদশী লেন্থ্‌ৎসা নাকি বুজোরের রক্ষিতা ছিল। কথাটা মিথ্যে, মেয়েটা কিন্তু এই মিথ্যা বটনাকেও কাজে লাগাতে ক্রটি কবলো না। সে কম্যুনিষ্ট-দলনেব প্রধান পাণ্ডা, 'কম্যুনিষ্ট ব্রিগ্রেডে'ব বড কর্তা, রুদ্রমূর্তি ব্যান্‌সিউলেস্কুব কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। জিজ্ঞেস কবলো, "শুন্‌ছি বুজোব নাকি মারা গিয়েছেন।"

ব্যান্‌সিউলেস্কু জবাব দিল, "বাজে গুজব, সে বেঁচে আছে।"

লেন্থ্‌ৎসা সাহসে ভর ক'রে তাব আর্জি পেশ কবলো, "আপনি তো জানেন, উনি ছিলেন আমার ভালোবাসাব লোক। আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই যে, উনি বেঁচে আছেন।"

বডসাহেব পিছন ফিরে বসলো। সরকাব থেকে কডা হুকুম রয়েছে, এই কয়েদীকে কোনো লোকেরই সংস্পর্শে আনা চলবে না।

লেন্থ্‌ৎসা মরীয়া হয়ে ধ'রে বসলো। ভয় দেখালো, সে একটা হুলুস্থূল বাধাবে, কত কাকুতি মিনতি ক'বে দেখলো। শেষ পর্যন্ত ঐ রাক্ষসটার কাছে নতজানু হয়ে কাঁদতে লাগলো। তারপর, যা দেখলেও বিশ্বাস হয় না, তাই ঘটলো। অনেক দ্বিধার পর, কে জানে কেন, (করুণায় নয় নিশ্চয়), বড সাহেব মুখ

ফিরিয়ে খেঁকিয়ে উঠলো, "মরগে যা, নিজে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা ক'রে, কথা ক'য়ে আয়। তিন মিনিট সময় দিচ্ছি।"

তালা-আগল খোলা পাওয়ার ছাড়পত্র নিয়ে লেম্নুৎসা চললো একটা দীর্ঘ অন্ধকার গলি-পথে। দেওয়াল থেকে যেন বরফের হাওয়া বেরুচ্ছে। অন্তহীন পথটার একজায়গায় এসে জেলার থামলো। তালায় চাবি ঢোকানো হ'ল, ভাবী কবাটটা ঠেলে একপাশ ক'রে দিতে, লোহাব গরাদ চোখে পড়লো। ভিতরে নজর যেতে, লেম্নুৎসা দেখলো বুজোরের কাপড় চোপড় ছিঁড়ে গিয়েছে, দাড়ীতে মুখখানা ভ'রে উঠেছে। কাঠের খাটটার ওপব তিনি হাত-পা গুটিয়ে প'ড়ে আছেন। লেম্নুৎসা লক্ষ্য করলো, দবজা খুলতেই আধ-অন্ধকার গলি-পথ থেকে যে ক্ষীণ আলোকটুকু নেলে গিয়ে পড়লো, তাতেই তাঁব চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছে।

বন্দীব মুখে একটা পাগলাটে ভাব। বেশ বোঝা যায়, তাঁব অবস্থা আর স্বাভাবিক নাই, ছ'বৎসর অন্ধকারের মধ্যে উৎপীড়ন ভোগ করতে করতে তাঁব মানসিক বিকৃতি ঘটেছে। আকস্মিক আবেগে লেম্নুৎসা গরাদের ফাঁক দিয়ে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, জেলার ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল। কয়েক মুহূর্ত লেম্নুৎসা স্তম্ভিত হয়ে রইলো, তার বাক্য-স্ফূর্তি হ'ল না।

পরে, নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে সে বললো, "কমরেড্ বুজোর, বন্ধুদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে অভিবাদন জানাতে এসেছি।"

এই কণ্ঠস্বর শুনে বন্দীর মধ্যে, বন্দীর অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে যেন একটা বিপর্যয় ঘ'টে গেল। তাঁর সমস্ত দেহে একটা কিসের যেন আলোক ঝল্‌কে গেল। তিনি কথা বল্‌লেন,—অর্ধমৃতের মতো অতি ক্ষীণ, অথচ সুস্পষ্ট কণ্ঠে তিনি যা বল্‌লেন সেটা তাঁর মৃত্যুর মতো ভয়াবহ একক জীবনের, প্রতি মাসের, প্রতি বৎসরেব, একমাত্র ধ্যানের বস্তু। সে কথা তাঁর নিজের সম্বন্ধে

নয়, বন্ধুদের সম্বন্ধে নয়, আত্মীয়-পরিজন সম্বন্ধে নয়, সে তাঁর সমগ্র জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বময় ভাবনা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—

"রুশিয়ায় বলসেভিকরাই এখনও সবল আছে তো?"

"আছে, আছে।"—লেন্থুৎসা ব্যগ্রকণ্ঠে জানালো, "আছে।"

জেলার রূঢ়ভাবে ধমক দিয়ে উঠলো "রাজনীতির চর্চা নিষেধ আছে না?"

লেন্থুৎসা এবার জিজ্ঞাসা করলো, "কমরেড্ বুজোর, আপনার কি কোনো কিছুর দরকার আছে?"

বুজোরের সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, "না। আমি এখন সুখী।"

তারপর বিদায় নেওয়া হ'ল। বুজোরকে দিতে পারবে আশা ক'রে, লেন্থুৎসা সঙ্গে কিছু খাবার, ক'খানা বই এনেছিল, সেগুলো দেওয়া গেল না। আইনভঙ্গ তো চল্‌তে পারে না। কারও কাছ থেকে কিছু নেবার হুকুম বুজোরের নাই। *

* ফরাসী গল্প :—(আঁরি বারবুস)

তেপান্তরে

পেবেকফ্ থেকে যখন বেরুলাম, মেজাজ উঠেছে চরমে, জঠরে জ্বলছে নেকড়ে বাঘের ক্ষুধা, অন্তরে সারা দুনিয়ার উপর একটা বিপুল বিদ্বেষ। চুরি ক'রে হোক্, খেটে হোক্, কিছু সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে পূরো বারো ঘণ্টা আমাদের সমস্ত শক্তি ও কৌশল ব্যর্থ প্রয়োগ করার পর নিঃসংশয়ে যখন বুঝলাম ও দু'টির কোনোটাই সেখানে সম্ভব নয়, তখন সম্মুখে এগুনোই স্থির হ'ল। কিন্তু কোথায়? যে চুলোয় হোক্, সম্মুখে।

এ বিষয়ে সকলে যে একমত সেটা বুঝলাম মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে। অবশ্য জীবনের যে পথে এতদিন আসা গেল, সে-পথ ধ'রে এগুতে আমরা যে কোন রকম গররাজী ছিলাম, এমন নয়। যা হোক্, সিদ্ধান্তটি গৃহীত হ'ল বিনা বাক্যব্যয়ে, আমাদের ক্ষুধিত চক্ষের ক্রুদ্ধ দীপ্তিতে সেটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

দলে ছিলাম আমরা তিন জন। দিন কয় আগে নীপার নদীর ধারে খেরসনে একটা তাড়িখানায় আমাদের প্রথম পরিচয়। আমাদের মধ্যে একজন এক কালে রেলওয়ে পল্টনে সৈনিক ছিল, পরে পোল্যাণ্ডে ভিশ্চুলার ধারে কোন রেলওয়েতে মজুরী করতো। তার মাথার চুলগুলো লাল্চে, দেহ বলিষ্ঠ, সে জর্মন ভাষায় বল্তে কইতে পারতো, তা'ছাড়া, কয়েদী জীবনের যাবতীয় তথ্য ছিল তার নখাগ্রে।

প্রায়ই কিছু-না-কিছু সঙ্গত কারণ থাকে ব'লে আমাদের মতো লোকে নিজেদের অতীত কাহিনী নিয়ে কোনো প্রকার আলোচনা পছন্দ করে না। কাজেই যে যা বলে তা মেনে নেওয়াই আমাদের দস্তুর, অর্থাৎ আমরা কি, সে সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসটা নিছক বাহ্যিক, ভিতরে ভিতরে আমরা নিজেদিকেই বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারি না।

আমাদের দ্বিতীয় সাথীটির চেহারা ছিল চিম্‌সে, সে ছিল মাথায় খাটো, আর তার পাতলা চাপা ঠোঁট দুটিতে যেন অবিশ্বাস ফুটে বেরুতো। সে নাকি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। আমি এবং সৈনিকটি অবশ্য নির্বিবাদে তাই মেনে নিলাম। সে ছাত্র, চোর কি পুলিসের গুপ্তচর, যাই হোক্ না, আমাদের কাছে সব সমান কথা। এইটুকু জানলেই যথেষ্ট যে, সে আমাদের স্বগোত্র। সেও খেতে পায় না, তার ওপরেও পুলিসের অনুগ্রহদৃষ্টি, গেঁয়ো চাষীরা তাকেও সন্দেহের চক্ষে দেখে। আর ঐ দুটি জাতকে সেও আক্রান্ত বুভুক্ষ পশুর মতো নিস্ফল আক্রোশে ঘৃণা করে। আমাদের মতো সেও দুনিয়ার সবার ওপর কোনও দিন একটা বিরাট প্রতিশোধ নেবে এই স্বপ্ন দেখে—এক কথায় প্রাকৃতিক বা জৈব জগতে তার অবস্থা আমাদের থেকে একটুও স্বতন্ত্র নয়, আমরা এক গোয়ালেরই গরু।

বিভিন্ন চরিত্রের লোককে একসূত্রে গেঁথে নিতে দুর্ভাগ্যের জুড়ি নাই, আমরা মর্মে মর্ম বুঝেছিলাম, নিজেদিগকে দুর্ভাগা মনে করার অধিকার আমাদের আছে।

দলের তৃতীয় ব্যক্তি আমি। নম্রতা আমার স্বভাবসিদ্ধ, অতি শৈশব থেকেই আমি এ গুণের পরিচয় দিয়ে আসছি, সুতরাং নিজের সদ্‌গুণের কীর্তনটা নাই করলাম। অতিসারল্যের ভাঁড়ামি করবারও ইচ্ছা নাই। কাজেই নিজের চারিত্রিক দোষত্রুটিগুলোও চেপে গেলাম। নিজের চরিত্র সম্বন্ধে এইটুকু আভাষ দিলেই বোধ করি যথেষ্ট হবে যে, আমি

চিরকাল নিজেকে আর সবার চেয়ে ভাল মনে ক'রে এসেছি এবং আজও করি।

পেরেকফ ছেড়ে এগিয়ে চল্‌লাম। আমাদের সেদিনকার লক্ষ্য ছিল বিরাট প্রান্তরের মধ্যে কোনও রাখালকে পাকড়াও করা। এক্‌ আধ টুক্‌রো রুটি সব সময়েই এদের কাছে চাওয়া যায়, ভবঘুরেদের এরা বড একটা বিমুখও করে না। আমি চল্‌ছিলাম সৈনিকটির পাশে পাশে, ছাত্র ছিল আমাদের পিছনে। তার স্কন্ধে যে জিনিষটা ঝুল্‌ছিল, এক কালে সেটা কুর্তাজাতীয় কিছু ছিল, তার ওপরের দিকে সরু-হয়ে-ওঠা, ছোট-করে-ছাঁটা মাথাটার ওপর বিরাজ করছিল একটা ছেঁড়া টুপি, লিক্‌লিকে পা দু'খানা ঢোকে ছিল বিচিত্রবর্ণ, তালি মারা, ধূলিধূসর একটা পায়জামা, জামার আস্তর থেকে স্থতো বে'র করে পায়ের সঙ্গে বাঁধা ছিল রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া এক জোড়া জুতোর শুক্‌তলা, ও অবশ্য সেটাকে বলতো 'চটি'। পিটপিটে উজ্জ্বল চোখ মেলে রাজ্যের ধূলো উড়িয়ে সে মুখ বুঁজে পথ হাঁটছিল। সৈনিক ভায়ার গায়ে ছিল একটা লাল রঙের মোটা স্থতোর কামিজ,—তার নিজের ভাষায়, খেরসনে স্বহস্তে-সংগৃহীত লাল কামিজের উপর তূলো-ভরা ফতুয়া, মাথায় পল্‌টনী কায়দায় ডান-কপালের-উপর-কাৎকরা কিম্ভূত রঙের একটা ফৌজীটুপি। পরণে ঢিলে মোটা পায়জামা, পায়ে জুতো নাই। আমারও পা ছিল খালি। এগিয়ে চলেছি। আমাদের চারিদিকে স্থদূর আস্তীর্ণ প্রান্তর কোন বিরাটের আভাস নিয়ে নির্মেঘ নিদাঘ-আকাশের উত্তপ্ত নীল চন্দ্রাতপের তলে একটা গোল কালো থালার মতো প'ড়ে রয়েছে। তার বুক চিরে একটা প্রশস্ত রেখায় চ'লে গিয়েছে ধূলিধূসর পথখানা। আমাদের পা যেন পুড়ে যাচ্ছিল। জায়গায় জায়গায় ফসল কাটা হয়ে গিয়েছে। সৈনিক বন্ধুর অমুণ্ডিত গণ্ডের সঙ্গে স্থানগুলোর ছিল একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য।

বন্ধুটি পথ চল্‌তে চল্‌তে মোটা ভাঙা গলায় গান ধরেছিলেন "তব পুণ্যাহে

মোরা ভজি" পল্‌টনে থাক্‌তে পল্‌টনী গির্জার কীর্তনিয়া গোছের কিছু একটা কাজও সে করেছিল, কাজেই ভজন ও গির্জা-সঙ্গীতের ভাণ্ডার ছিল ওব সুপ্রচুর, আমাদের কথাবার্তায় একটু শৈথিল্য এলেই সে এগুলোর যথেচ্ছ অপব্যবহার করতো।

সম্মুখে দিগন্তের গা বেয়ে বেগুনী হতে ফিকে গোলাপীতে মিলিয়ে আসা একটা স্নিগ্ধ-কান্তি সুষ্ঠ রেখা এঁকে বেঁকে মাথা তুলেছে। সেদিকে চেয়ে ছাত্রটি কর্কশকণ্ঠে ব'লে উঠলো "নিশ্চয় ওগুলো ক্রিমিয়া পর্বত"। "পর্বত"? সৈনিকটি বললো "পর্বত? ওযে এখনও অনেক দূরে, বন্ধু, ও যা দেখছো তা হ'ল মেঘ। শুধু মেঘ! কিন্তু কি চমৎকাব, ঠিক যেন বসালো মোরোব্বা আব দুধেব মতো।"

আমি এব ওপর একটা টিপ্পনী কাটলাম, "আহা! সত্যিই মোবোব্বা আব দুধ হ'লে, কি মজাটাই না হ'ত।" সহসা আমাদের জঠরানল দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। এ এক আচ্ছা অভিশাপ!

সৈনিক বন্ধু একথা শুনে সশব্দে থুতু ফেললো:—"দূব শালা! এ পর্যন্ত একটা জ্যান্ত প্রাণীরও কি দেখা মিললো! কোথাও কেউ নাই। শীতকালেব ভালুকের মতো নিজেব হাত চোষা ছাডা গত্যন্তব দেখছি না"। তা শুনে ছাত্রটি বললো, "আগেই তো বলেছিলাম যেদিকে লোকালয় পাওয়া যাবে সেদিকে চলো। বোঝো এখন।" সৈনিক ঝাঁঝিয়ে উঠলো, "বলেছিলে নাকি! তা' তুমি না বললে আর বলবে কে? লেখাপডা জানা লোক তুমি। কিন্তু লোকালয় পেতে কোন্ পথে, শুন্‌তে পাই?"

ছাত্র বন্ধু আর কোনোও উচ্চবাচ্য করলো না, ঠোঁট চেপে রইলো। সূর্য তখন অস্ত গিয়েছে। দিগ্বলয়ে মেঘমালা অবর্ণনীয় বিচিত্র আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। হাওয়ায় লোনা মাটির গন্ধ। সেই মিষ্টি শুক্‌নো গন্ধে আমাদের ক্ষুধা তীব্রতর হয়ে উঠলো। পেটের মধ্যে একটা যন্ত্রণা বোধ হ'তে

লাগলো। সে কি অদ্ভুত অসোয়াস্তি। মনে হচ্ছিল শরীরের মাংসপেশীগুলো হ'তে সমস্ত রস যেন চুইয়ে পড়ছে, সেগুলো যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, তাদের সজীব নমনীয়তা যেন লোপ পেতে বসেছে, গলা আর মুখের ভিতরটা শুষ্কতায় টনটন্ করতে লাগলো। মাথা ঘুরতে লাগলো, চোখের সুমুখে ছোট ছোট ছায়াবস্তু নৃত্য সুরু করলো। সেগুলোকে কখনও দেখছিলাম সিদ্ধ মাংস টুক্‌রোর মতো, কখনও বা পাউরুটির মতো। স্মৃতির মোহিনী মায়ায় সেগুলোর যখন গন্ধও পেতে লাগলাম তখন মনে হ'ল পেটের মধ্যে কে যেন ছুরি চালিয়ে দিচ্ছে।

তবুও আমরা এগিয়ে চল্‌লাম, চলি আর নিজেদের অনুভূতি সম্বন্ধে আলোচনা করি, চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি, যদি কোথাও মেষ-টেষের কোনোও চিহ্ন পাওয়া যায়, কান খাড়া থাকে যদি কোনো তাতারের আর্মানিয়ার বাজার-মুখো ফল-বোঝাই গাড়ীর ক্যাচর ক্যাচর শব্দ শুনতে পাই।

কিন্তু হায়রে! এযে তেপান্তর, একেবারে নির্জন, নিস্তব্ধ। এই দুঃসময়ের প্রারম্ভে আমরা মাত্র দু'সের রুটি এবং গোটা পাঁচ ছয় ফুটি তিনজনে ভাগ ক'রে খেয়েছিলাম, তারপর, ক্রোশ তের পথ হেঁটে পেরেকফের বাজারে এসে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই পেটের জ্বালা ধরেছিল। ন্যায্য কথা বলতে হ'লে স্বীকার করতে হয়, ছাত্র সত্যিই আমাদিকে রাত্রে না ঘুমিয়ে "কাজে" লাগবার পরামর্শই দিয়েছিল। সভ্যসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির শ্লীলতাহানির কোনো প্রকার পরিকল্পনা উল্লেখ করাটা গর্হিত, সুতরাং ও কথাটা না হয় নাই আলোচনা করলাম। আমি শুধু ন্যায্য বিচারের খাতিরেই এ কথা তুলে ফেলেছি। নইলে ইতরামি করা তো আমারই স্বার্থের প্রতিকূল। আমি কি জানিনা আমাদের এই উচ্চ সভ্যতার যুগে লোকে ক্রমেই কেমন সহৃদয় হয়ে উঠ্‌ছে, প্রতিবেশীকে টুঁটি টিপে মারবার সময় লোকে এখন

ভব্যতার গণ্ডী ছাড়ায় না, কাজটা যথাসম্ভব দরদের সঙ্গেই সমাধা করে। আমার নিজের টুঁটির সাক্ষ্য থেকেই আমি এই নৈতিক প্রগতির পরিচয় পেয়েছি আর ঐ অভিজ্ঞতার জোরেই তো আমি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে এ কথা বল্‌তে পারছি যে, জগতে সব কিছুরই ক্রমোন্নতি হচ্ছে, আর এই প্রগতিটা বিশেষ ক'রে লক্ষণীয় হয়ে উঠছে জেল, তাড়িখানা আর বেশ্যালয়ের বাৎসরিক সংখ্যাবৃদ্ধিতে।

থাক্‌গে সে সব কথা। ক্ষুধায় লালা গিলে, গল্পগুজবে পেটের জ্বালাটা শান্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে আমরা সেই জনমানবশূন্য নিস্তব্ধ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলতে থাক্‌লাম অস্পষ্ট-আশা-ভরা সূর্যাস্তের রক্তিমাভার দিকে। সম্মুখে, সূর্যদেব তাঁর অন্তিম রশ্মিচ্ছটায় মেঘমালাকে রঞ্জিত ক'রে সেগুলোর অন্তরালে ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছেন। পিছনে, দুপাশে, একটা নীলাভ অন্ধকার, প্রান্তর থেকে আকাশের দিকে উঠে, চারিদিকের সেই নিষ্ঠুর দিগন্তসীমাকে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ ক'রে তুলছে।

সৈনিকভায়া মাটি থেকে এক টুকরো কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে বললো, "আগুন জ্বালাবার জন্য কিছু সংগ্রহ করো ভাই, এই তেপান্তরেই তো রাতটা কাটাতে হবে। শিশিরও পড়্‌ছে। কাঠ-কুটো যা পাও কুড়িয়ে চলো।"

আমরা দুভাগ হয়ে রাস্তার দুপাশে শুকনো ঘাস, কাঠকুটো যা পেলাম, কুড়াতে সুরু করলাম। যতবার মাটির দিকে ঝুঁকি, শরীর নেতিয়ে পড়তে চায়, মনে হয় শুয়ে পড়ি, শুয়ে পড়ে এই কাল কাল মাটিগুলো খাই—যতক্ষণ পেটে তিল স্থান আছে শুধু খেয়ে যাই, তারপর ঘুমোই, সে ঘুম যদি শেষ ঘুমও হয়, তাতেই বা আপত্তি কি? খাওয়া তো হবে মুখগহ্বর থেকে বিশুষ্ক গলনালী বেয়ে, যা-হোক-কিছু-হজম-করার-দুর্বার-বাসনায় উন্মত্ত, ক্ষুধিত, মোচড়-পীড়িত এই ছার জঠরটাতে ঐ আতপ্ত ঘনবস্তুটার ধীরে ধীরে নেমে যাওয়ার অনুভূতিটা তো পাওয়া যাবে।

সৈনিকের দীর্ঘশ্বাস শুনলাম, "গাছের শিকড-টিকডও যদি পাওয়া যেত। অনেক শিকডই তো খাওয়া যায়। কিন্তু এই লাঙল দেওয়া কালো মাটিতে একটাও কি শিকড পড়ে আছে।"

দেখতে দেখতে দক্ষিণ দেশের রাত্রি নামলো। সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু মিলোতে না মিলোতে নীল আকাশে তারা ফুটে উঠলো, চারপাশের ছায়া জমাট বেঁধে এল, বিশাল প্রান্তরটার অন্তহীন সমতলতা অন্ধকারে আত্মগোপন করলো।

ছাত্রের চাপা গলার আওয়াজ শোনা গেল, "আমাদের বাঁদিকে কে যেন একজন শুয়ে আছে।" "মানুষ ?" সৈনিক সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলো "মানুষ ? তা এখানে শুয়ে থাকতে যাবে কেন ?" ছাত্র যেন ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, "গিয়ে তাই জিজ্ঞেস করোনা। ও যখন এই মাঠের মধ্যে শুয়ে আছে ওর কাছে রুটি থাকা অসম্ভব নয়।" তার কথামতো বাঁদিকে তাকিয়ে সৈনিক একবার থুতু ফেল্লো, তারপর সঙ্কল্প স্থির ক'রে নিয়ে বললো, "চলো, ওর কাছেই যাওয়া যাক্।"

রাস্তার বাঁ পাশে, প্রায় একশো হাত দূরে একটা লোক যে ছোট্ট একটা কালো ঢিপির মতো পড়ে আছে—এটা আবিষ্কার করা ছিল কেবল ছাত্রের ঐ সবুজ তীক্ষ্ণ চোখদুটোর পক্ষেই সম্ভব। চষা মাটির ডেলাগুলোর ওপর দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্‌লাম, খাদ্য পাওয়ার নবজাগ্রত আশাতে আমাদের জঠরজ্বালা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। আমরা তার খুব কাছে এসে গেলেও লোকটার কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

"হয়তো ওটা মানুষই নয়।" সৈনিকের বিষণ্ণ স্বরে আমাদের সকলেরই আশঙ্কা ব্যক্ত হ'ল। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের সন্দেহভঞ্জন ক'রে মাটির ওপর ঢিপিটা ধড্‌মড্‌ ক'রে নড়ে উঠ্‌লো, আমরা দেখতে পেলাম একটা জলজ্যান্ত মানুষ হাঁটু গেড়ে বসে আমাদের দিকে তার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রে ধরেছে।

"থামো, নইলে গুলি করলাম," লোকটার কর্কশ কম্পিত কণ্ঠস্বর আমাদের কাণে পৌছলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্ষিপ্র "ক্লিক্" শব্দে বায়ুমণ্ডল একবার কেঁপে উঠলো। যেন কারও অলক্ষ্য আদেশে আমরা দাঁড়িয়ে পড়্‌লাম। এই রকম মধুর অভ্যর্থনায় অভিভূত হয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমাদের বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

সৈনিকভায়া বিড বিড ক'রে বল্‌লে, "বেটা আচ্ছা শয়তান তো!" ছাত্র গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলে, "হুঁ, বিভল্‌ভার নিয়ে রাস্তায় বেরনো হয়েছে, এ মাছের তেল আছে খুব।" "এই", সৈনিক চীৎকার ক'রে ডাক্‌ল "এই, শুনছো"। বোঝা গেল, ও কোনোও উপায় ঠাউরে ফেলেছে।

লোকটীর ভাবভঙ্গীর কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না, তার দিক হ'তে কোনো জবাব এল না।

"বলি, শুনছো? আমরা তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। আমাদের কিছু রুটি দাও। আমরা না খেতে পেয়ে মরছি। লক্ষ্মী ভাইটী, দোহাই ভগবান! আমাদিকে কিছু রুটি দাও। আর, তা না দাও তো—চুলোয় যাও।" শেষের কথাগুলো অবশ্য চাপা গলাতেই বলা হ'ল।

লোকটা তবুও চুপ।

রাগে হতাশায় কাঁপতে কাঁপতে সৈনিক এবার খেঁকিয়ে উঠলো, "কানে তালা দিয়েছো নাকি? আমাদিকে কিছু রুটি দাও না! আমরা তোমার কাছেও যাচ্ছি না। ছুড়ে দাও ওখান থেকেই।" লোকটা হঠাৎ বলে উঠলো "আচ্ছা"। ওই রূঢ়কণ্ঠের আকস্মিক 'আচ্ছার' পরিবর্তে ও যদি বলত "ভাইরা আমার!" যদি তার কথাগুলোর মধ্যে বিশ্বের পূততম, নির্মলতম ভারও প্রকাশ পেত, তা'হলেও আমরা এত বেশী উত্তেজিত বা 'মানুষের মতো' হয়ে উঠতে পারতাম বলে মনে হয় না।

"আমাদিকে দেখে ভয় পাবার কোনো কারণ নাই, বন্ধু!" সৈনিক বেশ

মোলায়েম ভাবেই এ কথাটা জানিয়ে দিল। একথা বলবার সময় তার ঠোঁটে একটা বেশ তোয়াজী হাসি ফুটে উঠ্‌লো, প্রায় বিশ পা দূরে থাকার দরুণ সেটা যদিও লোকটাব চোখে পডবাব কোনো সম্ভাবনা ছিল না,—"আমবা নিরীহ লোক, রুশিয়া হ'তে কুবানে চ'লেছি। টাকা কড়ি সব হাবিয়ে গিয়েছে। খাবার যা ছিল খেয়ে ফেলেছি। আজ দুদিন পেটে একটাও দানা প'ড়নি।" "একটু দাঁড়াও," লোকটাকে শূন্যে হাত ছুড়তে দেখা গেল। একতাল কাল পদার্থ সোঁ ক বে এসে চষা জমিব উপব পডামাত্র ছাত্র তাব উপব হুমড়ি দিয়ে পড়লো।

"আচ্ছা, আবও নাও, এই—এই—এই, ব্যস্! আব নাই"। এই অভিনব ঢঙে দেওয়া রুটিব টুক্‌বোগুলো ছাত্র একত্র কবলো। দেখা গেল প্রায সেব দুই ওজনের মাটিমাখা বাসি রুটি। মাটিমাখা বলে অবশ্য আমাদেব একটুও বেগ পেতে হ'ল না, আব রুটি বাসি হওয়াতে আমবা ববং একটু খুসিই হ'লাম কাবণ কম রস থাকাব দরুণ নতুনেব চেয়ে বাসি রুটিই আমাদেব কাছে বেশী খাদ্য হয়ে উঠেছিল। "এই নাও,—এই নাও,—এই"—সৈনিক ভাগ ক'বে দিল। "ঠিক সমান হ'ল না, ছাত্র মশায়, তোমাব ভাগ থেকে আমাকে একটু নিতে হ'চ্ছে, না হ'লে ওর ভাগটায় কম পড়ে"। তার রুটি থেকে এক আউন্সেব অতি সূক্ষ্ম ভগ্নাংশের লোকসানটুকু ছাত্র বিনা প্রতিবাদে স্বীকাব ক'বে নিল। রুটি পাবা মাত্র আমি চিবোতে সুরু ক'রলাম, আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে। চোয়াল তখন পাথর পেলে পাথব চিবোয়, কাজেই চোয়ালটাব প্রবল উৎসাহ দমন করা বড সহজ হচ্ছিল না। প্রথমটায় গলার ভেতর থেকে খেকে খেঁচুনি ধরছিল, সেটা ধীরে ধীরে শান্ত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আরাম অনুভব করলাম। অনির্বচনীয় বর্ণনাতীত রকম মধুব, সেই রুটি। গ্রাসে গ্রাসে জ্বলন্ত পেটেব মধ্যে ঢোকে, আর মনে হয় যেন তক্ষুণি রক্ত ও মস্তিষ্কে পরিণত হ'য়ে যাচ্ছে। পেট যত ভ'রে আসে অন্তরের মধ্যে ততই কী এক

পুলক উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে—অদ্ভুত, শান্তিভবা, প্রাণমাতানো সে পুলক। শবীবে মনে একটা তন্দ্রালুতা। ভুলে গেলাম বিগত অভিশপ্ত দিনকয়টির একটানা বুভুক্ষা, ভুলে গেলাম সাথীদেব কথা। তাবাও তখন আমাব মতো বিচিত্র অনুভূতিতে ডুবে গিয়েছে। কিন্তু সেই রুটিব শেষ টুক্‌রোটা হাত থেকে যেই মুখেব মধ্যে প্রবেশ ক'বছে, অমনি আবাব ভীষণ ক্ষুধাব জ্বালা বোধ হ'তে লাগ্‌লো।

মাটিব ওপব বসে, পেটে হাত বুলোতে বুলোতে সৈনিকভায়া অস্পষ্ট স্বরে বললো, "বদ্‌মাসটাব কাছে বোধহয় আবও আছে—মাংস থাকাও বিচিত্র নয়"।

ছাত্র চাপা গলায় বল্‌লো, "আলবৎ আছে। রুটিতে মাংসেব গন্ধ পাচ্ছিলাম। আমি ঠিক বল্‌ছি ওব কাছে আবও রুটি আছে। ওব কাছে ওই বিভল্‌ভারটা যদি না থাকত"

"লোকটা কে হে?"

"বেশ দেখা যাচ্ছে, জাতে ইহুদী।"

সৈনিক সিদ্ধান্ত কবল "না, জাতে কুত্তা"।

আমবা ঘেঁসা-ঘেঁসি ক'বে বসে, যে দিকটায় আমাদেব উপকাবক ম'শায় বিভল্‌ভাব হাতে বসেছিলেন সেদিকে আড়চোখে চাইতে থাকলাম। সেদিক হ'তে কোনো সাড়া এল না।

আমাদিকে ঘিবে বাত্রির বহস্য ঘনীভূত হ'য়ে এল, তেপান্তবেব স্তব্ধতা, পরস্পবের নিঃশ্বাসেব শব্দটাও শোনা যায়। মাঝে মাঝে পাহাড়ে ইঁদুবেব বিমর্ষ চীৎকাব ভেসে আস্‌ছে। মাথাব ওপব আকাশের সজীব পুষ্প তাবাগুলো ঝিক্‌মিক্ কবছে। আমবা ক্ষুধিত।

একথা আলবৎ সগর্বে বলবো যে সেদিনকাব অদ্ভুত রজনীর দু'দণ্ডেব সাথীদের চেয়ে আমাব অবস্থাটা কিছু ভালো ছিল না, মন্দও ছিল না, তবু আমিই প্রস্তাব কবলাম, লোকটার কাছে একবাব যাওয়া যাক্। ওর দৈহিক

কোনো ক্ষতি করবার প্রয়োজন নাই, তবে ওর কাছে খাবার যা আছে, সেটা ছাড়া হবে না। এতে গুলি ছোড়ে, ছুড়ুক। আমরা তিনজন আছি, গুলি লাগে তো একজনেরই লাগবে, আর তাও একরকম অসম্ভব। তাছাড়া একান্তই যদি গুলি লাগে,—আঘাতটা মারাত্মক নাও হ'তে পারে।

সটান লাফিয়ে উঠে সৈনিক বল্‌লো "চলো"। আমরা দু'জন প্রায় দৌড়েই চললাম, ছাত্র সাবধানী, সে চল্‌লো পেছনে। "বন্ধু"! সৈনিক অভিযোগের সু'রে ডাক দিল, "বন্ধু"! উত্তরে পেলাম একটা অস্পষ্ট কর্কশ কণ্ঠস্বর, বিভল্‌ভার টেপার "ক্লিক্‌" ক'রে একটা শব্দ, এক্‌টা ক্ষণিক দীপ্তি, একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ।

"ফস্কেছে!"—একলাফে লোকটার কাছে পড়ে সৈনিকভায়া জয়োল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠলো "ফস্কেছে। এখন, মানিক! এবার মজাটা টের পাওয়াচ্ছি দাঁড়াও।"

ছাত্র সোজা লোকটার থলির ওপর গিয়ে পড়ল, "মানিক" তখন চিৎপটাং হয়ে গোঙাতে সুরু করেছে, হাতদুটো দিয়ে আত্মরক্ষার প্রবল চেষ্টা করছে।

"সে হালুয়া! এ আবার কি?" সৈনিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, লোকটাকে লাথি মারতে সে পা উঠিয়েছিল, মারা হ'ল না। "বেটা নিশ্চয় নিজের গুলিতে নিজেই ঘায়েল হয়েছে।—এই! গুলিটা কি তোমাকেই লাগলো?"

ছাত্র তখন পরমানন্দে বলে চলেছে, "এই মাংস, এই পিঠে, এই ত বাবা রুটি!—অনেক আছে, আঃ, মরুক্‌ বেটা, জাহান্নামে যাক্‌। এসো আমরা খেতে লেগে যাই।"

লোকটার হাত থেকে আমি রিভলভারটা ছিনিয়ে নিলাম। সে তখন কাৎরানি থামিয়ে চুপ ক'রে পড়ে আছে। রিভল্‌ভারে তখনও একটা গুলি মজুত ছিল।

আবাব খাচ্ছি, নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছি। লোকটা তখন অসাড় হয়ে পড়ে আছে, একটা অঙ্গও নড়ছে না। আমরা সেদিকে আর ফিরেও চাইলাম না।

"ভাই সব, খাবার জন্যেই কি সত্যিসত্যি এই সব করেছিলে তোমরা?" হঠাৎ একটা কম্পিত, কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন এল।

তিনজনেই চমকে উঠলাম। বেশি কি,—ছাত্রেরও গলায় খাবাব আটকে যাওয়াতে সে মাটিব দিকে মুখ ক'বে কাশ্‌তে লাগলো। সৈনিকভায়া মুখে একগাদা খাবাব নিয়ে চিবোতে চিবোতে গালাগালি ক'রে উঠলো, "কুকুব কোথাকার, পেট ফেটে মবতে পাব নাই? ভেবেছিলে, আমবা তোমার চামড়া খসিয়ে নেব, না? তোমার চামড়া নিয়ে আমাদের কি উপকাবটা হবে? বেটা চামাব! গুলি চালাতে শিখেছ, না? বদমাস্ কাঁহাকা!" মুখে খাবাব, তাই গালাগালিটা তেমন জোবালো হ'ল না। ছাত্র ভয় দেখিয়ে বললো "দাঁড়াও না, খাওয়াটা হয়ে যাক্, তাবপব তোমার সঙ্গে একটা বোঝা পড়া হয়ে যাবে।" সঙ্গে সঙ্গে বাত্রেব সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'বে লোকটাব আর্ত বিলাপ আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না সুরু হ'ল। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম।

"ভাই সব, কেমন ক'বে জানবো বলো? ভয় পেয়ে গুলি করেছিলাম। নয়া এথেন্স থেকে বাড়ী যাচ্ছি। স্মোলেন্স্ক অঞ্চলে। ভগবান! জ্বরটা চেপে এল আবার। সূর্য ডুব্‌লেই, এই জ্বর পেয়ে বসে! বড় দুর্ভাগা আমি।

এই জ্বরেব জন্যই নয়া এথেন্স ছাড়্‌লাম। সেখানে ছুতোরের কাজ করতাম। ব্যবসা'য় আমি ছুতোর। বাড়ীতে বৌ ও একটা ছোট মেয়ে আছে। চার বছর তাদের দেখি নাই। ভাই সব, যা আছে সব খেয়ে ফেলো।" ছাত্র বলে উঠলো, "তার জন্যে তোমাব অনুমতিব অপেক্ষা কববো না।"

"হা ভগবান, শুধু যদি জান্‌তাম যে তোমরা নিরীহ, ভাল লোক। তা'হলে

কি গুলি ক'বতে যেতাম ? বাত্রে, এই তেপান্তবেব মাঠে একথা কে ভাব্বে, বলো ? এর জন্যে কি আমি দোষী ?"

কথা বলতে বলতে লোকটা কাঁদছিল। 'কাঁদছিল' বললে ঠিক বলা হয় না, তাব মুখ থেকে একটা কম্পিত করুণ আর্তধ্বনি বা'ব হচ্ছিল। সৈনিক ঘৃণাব স্বরে ব'লে উঠ্লো "এইবে প্যান্ প্যানানি স্বরু কবলো।"

ছাত্র বললো "ওব কাছে বোধহয় টাকাকড়ি কিছু আছে।" সৈনিক অনীমিলিত নেত্রে তাব দিকে চেয়ে একটু মুচ্কি হাসলো, "আন্দাজ কবাব ওস্তাদ দেখছি তুমি। ওঠো, এখন ঘুম দেওয়া যাক্গে।" ছাত্র জিজ্ঞেস কবলো, "ওব কি ব্যবস্থা হচ্ছে ?"

"ও চুলোয় যাক্। ওকে কি ঝলসিযে খেতে চাও নাকি ?"

"তাই কবা উচিত ওকে।" ছুঁচলো মাথাটা ঝাঁকিয়ে ছাত্র তাব বায জাহিব কবলো।

ছুতোব মশাযেব ভয় দেখানোতে আমবা যেখানে হাতেব কাঠকুটোগুলো ফেলে থম্কে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে সেগুলো কুড়িয়ে আনলাম। এনে, আগুন জেলে বসলাম। সেই নিস্তব্ধ বাত্রিব বুকে আগুন মিট্মিট্ ক'বে জ্বলতে লাগলো। যে জায়গায় বসেছিলাম, সেটা কতকটা আলোকিত হযে উঠলো। ক্রমে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল, তবে—আব একবাব খে'তে পেলে যেন ভাল হ'ত।

"ভাই সব," ছুতোবের গলা শোনা গেল। আমাদের থেকে একটু দূরে সে শুয়েছিল, মাঝে মাঝে তাকে যেন অস্পষ্টভাবে বিড বিড কবতে শুনছিলাম। সৈনিক বললো, "কেন ?"

"তোমাদের কাছে যাবো ? ঐ আগুনেব কাছে। আমি মবছি হাড়গুলো কন্কন্ করছে। ভগবান। বাডী পৌঁছানো আমার আর হ'ল না।"

ছাত্র বললো ' এসো, গডাতে গডাতে।"

আস্তে আস্তে, যেন হাত পা কিছু খসে না পড়ে এমনিভাবে সন্তর্পণে ছুতোর গুটি গুটি আগুনের কাছে স'বে এল। লোকটা ছিল লম্বা, ভয়ানক রোগা, গায়েব কাপড়জামা ভীষণ রকম ঢল্ ঢল্ করছে, বড় বড় ক্লিষ্ট চোখদুটীতে শরীরের যন্ত্রণা প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে। বেদনা-বিকৃত মুখখানা মৃত্যু-পাংশু, আগুনের আলোতেও তার রঙ হল্‌দে, মৃতবৎ দেখাচ্ছে। তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। তাকে দেখে আমরা একটা অবজ্ঞামিশ্রিত অনুকম্পা বোধ করলাম। লম্বা সরু সরু হাতদুটো আগুনের দিকে বাড়িয়ে, সে তার অস্থিসর্বস্ব আঙ্গুলগুলো ঘস্‌তে লাগলো। সত্যি, লোকটা দেখতে একেবারে কদাকার হয়ে উঠেছিল।

সৈনিকভায়া বিরক্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, "শরীরের এই অবস্থায় বাড়ী হতে বেরিয়েছ কেন বাপু? তাও আবার পায়ে হেঁটে, টাকা বাঁচাতে?" "লোকে আমাকে বেরুতে মানাই করেছিল। বলেছিল, জলপথে ক্রিমিয়ার পথে আসতে তবে হাওয়াটার জন্যে। এখন আমি এগোতে পারছি না। মরতে বসেছি, এই তেপান্তরে একাই মারা যাব। শকুনরা এসে আমার উপর ঠোকর মারবে, কেউ আমাকে চিনতেও পারবে না। আমার স্ত্রী ছোট মেয়েটা আমার পথ চেয়ে বসে আছে। চিঠি দিয়েছিলাম। তেপান্তরের বৃষ্টির জলে হাড়গুলো ধুয়ে যাবে ভগবান্! ভগবান্!" আহত নেকড়ে বাঘের মতো লোকটা ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। সৈনিক রেগে লাফ মেরে খাড়া হয়ে উঠলো, ধমকে বললো, "থেলে যা, ঘ্যান্‌ঘ্যানিটা থামাও বাপু। একটু শান্তি দাও আমাদের। মরছো? মরো। তার জন্য এত হল্লা করা কেন? তোমার অভাবে কারও দিন আট্‌কাবে না?"

ছাত্র পরামর্শ দিল, "মারো ওটার মাথায় একটা গাঁট্টা।"

আমি বললাম, "আমাদের ঘুমোতে দাও বাপু। অমন ক'রে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করলে আগুনের কাছে থাকা চলবে না তোমার, তা ব'লে দিচ্ছি।"

সৈনিক রাগের মাথায় বলে চললো "কথাটা কানে গেল ? যা বলা হ'ল তাই কব। ভেবেছো, এক টুক্‌রো রুটি ছুড়ে দিয়েছ আর গুলি চালিয়েছ ব'লে তোমাব ওপব আমাদেব অনুকম্পা জন্মে গিয়েছে , ভেবেছো, তোমায় আমরা সেবা কবতে লাগবো ? চুলোয় যাও। অন্যে হ'লে হয়তো ছোঃ।"

সৈনিক চুপ ক'বে আবার হাত পা বিছিয়ে মাটিব ওপব শুয়ে পডলো। ছাত্র শুয়েই ছিল। আমিও গডিয়ে পডলাম। ছুতোব ভয় পেয়ে গুটিসুটি মেবে তাল পাকিয়ে, আগুনেব কাছে এগিয়ে এল , আগুনেব দিকে চুপ ক'বে তাকিয়ে বইলো। আমি তাব ডান দিকে শুয়েছিলাম, তাব দাঁতেব ঠক্‌ঠকানি শুন্‌তে পাচ্ছিলাম। ছাত্র ছিল তাব বাঁ পাশে জডসড হয়ে শুয়ে, ভাবে বোধ হচ্ছিল ঘুমিয়ে পডেছে। সৈনিক চিৎ হয়ে, হাতেব ওপব মাথা বেখে, আকাশেব দিকে চেয়ে ছিল।

"কি চমৎকার বাত্রি ! কত তাবা !" তারপব আমাব দিকে মুখ ফিবিয়ে সে বলে চললো, "কি সুন্দব আকাশখানা , আকাশ তো নয়, যেন একখানা কম্বল। বেশ লাগে এই যাযাবব জীবন। ক্ষুধা আছে, শৈত্য আছে, তবুতো স্বাধীন। হুকুম চালাবাব কেউ নাই। নিজেই নিজেব মুনিব। নিজের মাথা চিবোতে চাও, কেউ 'না' বলবার নাই। কেমন সুন্দর ! এই কদিনের ক্ষুধায় আমাদেব মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছিল।—এখন তো বেশ শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছি। তাবাগুলো আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপছে, যেন বলছে, 'কুছ পবোয়া নাই, লাটিকিন্‌, ঘুবে বেডাও পৃথিবীময়। সব শিখে নাও, কাবও বশ্যতা স্বীকার কোরোনা।' আহা, মনে কি শান্তিই বোধ হচ্ছে। বলি ছুতোরভায়া, কেমন আছ ? আমাব ওপব রাগ কোরোনা যেন। ভয় করবার কিছু নাই। যদি তোমার সমস্ত রুটি খেয়েই থাকি, তাতে কি ? তোমার কাছে রুটি ছিল, আমাদের কাছে ছিল না , তাই তোমারটাই খেতে হ'ল। তোমার ঐ বোকার মতো গুলি চালান-টা ! তুমি আমাকে রাগিয়ে

দিয়েছিলে, তুমি পড়ে না গেলে, তোমার ঐ বেয়াদপির জন্য বেশ দু' ঘা দিতামও।· আব রুটি? কাল তো পেরেকফ পৌছুবে, সেখানে কিনে নিলেই পারবে। তোমাব কাছে পয়সাকড়ি আছে, তা' আমি জানি। বলি, কতদিন হ'ল জ্বরে ভুগ্‌ছ?"

অনেকক্ষণ ধবে সৈনিকেব গম্ভীর গলার গম্‌গমানি আর ছুতোরের কম্পিত কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাচ্ছিলাম। অন্ধকার ঘনকৃষ্ণ বাত্রি ক্রমেই জমাট বাঁধলো। সুগন্ধ রসবহ্ হাওয়াতে বুকটা ভবে উঠলো। আগুনটা কখনও শিখা মেলে, কখনও ধিকি ধিকি জ্বলে উত্তাপ দিচ্ছিল। চোখ বুজে এল। তন্দ্রার মধ্যে একটা স্নিগ্ধ পবিত্রভাব সমস্ত আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো।

"ওঠো শীগ্‌গীর। চলো, পালাই।"

অজানা একটা ভয়ে আমি লাফিয়ে উঠলাম। সৈনিক এতক্ষণ আমার কব্জিটা ধরে টানাটানি করছিলো।

"চলো পালাই, জল্‌দি"।

তার মুখখানা গম্ভীব, ক্লিষ্ট। আমি চাবপাশে একবাব তাকিয়ে নিলাম। ছুতোবের নিথব নীলচে মুখের ওপরে উদীয়মান সূর্যেব গোলাপী কিবণ এসে পড়েছে, তাব চোখে একটা ভীতি, কাচের মতো দীপ্তিহীন একটা দৃষ্টি। বুকের কাছটাতে জামাটা ছেঁড়া, দেহভঙ্গী অস্বাভাবিক, ভিমি হ'লে যেমন হয় সেই ধবণের।

"যথেষ্ট দেখা হয়েছে। এসো বল্‌ছি।"—সৈনিক ভায়া আমার হাত ধরে টান দিল। ভোরের কন্‌কনে হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করলাম, "ম'রে গিয়েছে?" সৈনিক কথাটা পরিষ্কাব করবার জন্য বললো "সেই রকম তো মনে হয়। তোমার গলাটা যদি টিপে ধরি, তা'হলে মরবে না তুমি?"

"কে কব্‌লে ? ঐ ছাত্রটা ?"

"না তো কে ? তুমি বোধহয় ? না আমি ? ভ্যালা রে ছাত্তর ! ওকে খতম্‌ ক'রে সঙ্গীদের ফ্যাসাদে ফেলে, মার টেনে চম্পট ! কাল এ কথা জান্‌লে আমি ও শালাকে খুন ক'রে ফেল্‌তাম। এক ঘুঁসিতেই সাফ্‌ ! কপালেব রগ ঘেঁসে এক ঘুঁসি। পৃথিবীর একটা ভার কমিয়ে দিতাম। বুঝতে পাবছো ওটাব কীর্তিটা ? এখন, আমাদের এমন ভাবে স'রে পডতে হবে যেন এই প্রান্তবেব মধ্যে কাবও নজবে না পডি। বুঝলে ? আজই ও লোকেব চোখে পডবে। তাবা দেখ্‌বে, ওকে মেরে কে ওব সব নিয়ে টিয়ে পালিয়েছে। তারপর সুরু হবে আমাদেব মতো যত সব ভবঘুবে লোকেব খোঁজ। ওবা জিজ্ঞেস করবে, কোথা থেকে আস্‌ছি ? বাত্রি কোথায় কাটিয়েছি ? হয়তো আমাদেব ধরবে। আমাদেব কাছে কিছু না পেলেও তাইতো। আমার বুকেই যে ওর বিভল্‌ভাবটা। নে ঝামেলা !" আমি তাকে সাবধান ক'বে দিলাম, "ওটা ফেলে দাও।" সে একটু চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করলে, "কেন ? এব দাম আছে। হয়তো ওরা আমাদের ধরতে পারবে না। নাঃ, ফেলবো না। বিক্রী কবলে তিন রুব্‌ল পাওয়া যাবে এখন। সঙ্গে একটা টোটাও আছে। শয়তানটা কত টাকা নিয়ে সরেছে, কে জানে ?"

"ছুতোবের ছোট মেয়েটার ভাগ্যি !"

"মেয়ে ? কাব মেয়ে ? ওঃ, ওর। সে বড হয়ে আমাদের তো আব বিয়ে করতে আসবে না। তবে তার কথা নিয়ে মাথা ঘামানো কেন ? চলো, চলো, পা চালাও, কোথায় যাওয়া যায় ?"

"তা তো জানি না। যে দিকে হয়, চলো।"

"আমিও জানি না, শুধু জানি—যে দিকেই যাবো, একই কথা। চলো ডাইনে। ওদিকে সাগরটা পাওয়া যাবে।"

আমি পিছনে চাইলাম। প্রান্তরের বুকে আমাদের থেকে অনেক দূরে

একটা কাল পাহাড মাথা তুলেছে। তার ওপব সূর্য কিবণ ঝল্‌মল্‌ কবৃছে।

"দেখা হচ্ছে বুঝি, বেঁচে উঠলো কিনা। ভেবো না, কেউ আমাদেব ধব্‌বে না। ছাত্তব বড ধূর্ত, ভাল কাম হাসিল করেছে।"

"সঙ্গী হিসেবেও চমৎকাব! কেমন ফ্যাসাদে ফেলেছে, দেখ দিকি। ভাইবে, যত দিন যাচ্ছে, লোকগুলো যেন ক্রমেই বদ্‌মাস হয়ে উঠছে।" সৈনিকেব কণ্ঠস্ববে একটা গাঢ বিষণ্ণতা।

প্রভাতেব বৌদ্রস্নাত নিস্তব্ধ নির্জন প্রান্তব দিগ্বলয় পর্যন্ত আস্তৃত। চাবিদিকে শান্ত করুণ সূর্যালোক, আকাশেব নীল চাঁদোয়াব তলে সেই অবিচ্ছিন্ন বিবাট প্রান্তবেব মধ্যে কোনো পাপ, কোনো অন্যায়ই সম্ভব বলে মনে হয় না। সঙ্গী সস্তা তামাকের একটা সিগাবেট পাকাতে পাকাতে বললো, "ক্ষুধা বোধ হচ্ছে ভাই।"

"কি খাবো? পাবো কোথায়?"

"সেই তো সমস্যা।"

হাসপাতালে আমাব পাশের বিছানায় শুয়ে এই গল্পের বক্তা এইখানে এসে চুপ কবলো, গল্পটীব উপসংহাব কবলো এই ভাবে, "ব্যস্‌ এই! সৈনিকেব সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল, সেবার আমবা "কাবা" প্রদেশ পর্যন্ত এক সঙ্গে হেঁটে এসেছিলাম। লোকটাব হৃদয় ছিল খুব দরাজ, অভিজ্ঞতাও ছিল অনেক। ও ছিল একেবাবে যাযাবর। আমি ওকে ভয়ানক শ্রদ্ধা করতাম। এসিয়া মাইনব পর্যন্ত এক সঙ্গে ছিলাম, তারপব ছাডাছড়ি হয়ে গেল।"

শুধোলাম, "ছুতোরটাকে তোমাব কখনও মনে পডে না?"

"দেখলেই তো—মানে—শুনলেই তো সব।"

"আর কিছু নয়?"

সে হেসে উঠল!

"ওর কথা আমার মনে থাকবে, কেমন ক'রে আশা করো তুমি? তার যে দশা হয়েছিল তাব জন্যে আমি তো আব দায়ী ছিলাম না, যেমন আমার এই দশার জন্যে তোমার কোনো দায়িত্ব নাই। কাউকেও কিছুব জন্যে দোষী করা চলে না, আমবা সবাই একজাতেব পশু।" *

* রুশীয় গল্প:—ম্যাক্সিম গোর্কী।

— অঞ্জলি —

[যার অভিজ্ঞতার কাহিনী তাঁর মুখ থেকে শুনে হোলি ফ্লানাগান এটি লিপিবদ্ধ ক'রে রাখেন।]

প্রথম বয়স। অল্পদিন হ'ল মস্কো এসেছি। একদিন দেখি, থিয়েটারে ঠেলাঠেলি ভিড়। শুনলাম, ইসাডোরা ডানকানের নাচ হবে। কিছু না বুঝেই দশজনের দেখাদেখি আমিও ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গান শুনেই আত্মহারা হয়ে গেলাম। তারপর, ইসাডোরা ডানকানের নৃত্য দেখতে গিয়ে চোখের জল আর বাধা মানে না, গাল বেয়ে হাতের উপর পড়ে, কী এক অপূর্ব বেদনায় হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে।

রুশিয়ার বড় বড় লোক সকলেই সেদিন সেখানে, জার, জার-মহিষী, ম্যামন্টভ, ষ্টানিস্‌লাভ্‌স্কি। অভিনেতা, চিত্রকর, গায়ক বা লেখকদের কেউ আর বাকী ছিল না। এক একটা নাচ শেষ হয়, আর বিপুল হর্ষধ্বনি ক'রে সকলে ষ্টেজের দিকে ছোটে। লাজুক ব'লেই বোধহয় আমি ওদের মতো ছোটাছুটি করতে পারিনি, নিজের জায়গায় গুটি মেরে বসেছিলাম, হাত পা গুলো যেন বরফে জমে গিয়েছিল, বুক জুড়ে যেন একটা অগ্নিশিখা জ্বলছিল।

জনতার অধীর আহ্বানে ইসাডোরা যতবার ষ্টেজে আসছিলেন, শরীরের রক্তস্রোত যেন থেমে যাচ্ছিল, আর তিনি যখন নাচছিলেন, একটা অপূর্ব আনন্দহিল্লোলে আমার সমস্ত অন্তর তাঁর অভিমুখে ভেসে চলছিল।

ভেবেছিলাম, আরও দু'চার দিন সহরে থাকবো। ইসাডোরা ডানকানের নৃত্যের পর আর কিছু দেখবার প্রবৃত্তি রইলো না। সেই রাত্রেই গাঁটরিটা কাঁধে ফেলে বরফ-জমা রাস্তা ভেঙে গ্রামের দিকে বেরুলাম।

সেদিন থেকে ইসাডোরা ডানকান হলেন আমার মানস-দেবী। শুধু তাঁরই কথা ভাবতাম, ক্ষেতে কাজ করতে গিয়েছি, রাঙামাটীতে পা দিয়ে বীজ বসাচ্ছি, হঠাৎ মস্কোর রঙ্গমঞ্চের উপর ইসাডোরার অপরূপ মূর্তিটি চোখের সামনে ভেসে উঠতো, চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে যেত।

*　　　*　　　*

কয়েক বছর পরের কথা। বাবা মা মারা গেলেন। পড়াশুনা করতে আমি পিটার্সবুর্গ এলাম। অর্থাভাবের জন্য তখন কঠোর পরিশ্রম করতে হ'ত। দিনের পড়ার খরচ যোগাতাম রাত্রে কাজ ক'রে। কোনো দিনই থিয়েটারে যাওয়া ঘটেনি। সত্যি বলতে কি, যাবারও বড় প্রবৃত্তি ছিল না। ইসাডোরা ডানকানকে দেখার পর, আর কাউকে রঙ্গমঞ্চে দেখবার ইচ্ছে হ'ত না। এটা যে ভাল করতাম, তা বলছি না। জানি, ওটা নিছক বোকামি। তবু, কেমন যেন পেরে উঠতাম না।

একদিন আমাদের ক্লাসের এক মোটা মতো ছোকরা—থিয়েটার ঘোরা আর রঙ্গ-জগতের কার কার সঙ্গে ওর আলাপ আছে তা নিয়ে গল্প ক'রে বেড়ানো ছিল তার নেশা—আমায় ডেকে বললে, "পিটার্সবুর্গে এবার কে আসছে শুনেছো হে? তা তুমি আর তার কি জানবে? ও সবের তো খোঁজই রাখো না। একজন নাম-করা নর্তকী, ইসাডোরা ডানকান। বিয়ে করেছে একজন রাশিয়ান কবিকে। হপ্তা দুই বাদে এখানে তাঁর নাচ হবে।"

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে চোখ রেখে আমি তখন শ্লাইডের উপর দুটী বেগুনী রঙের ফুটকি দেখছিলাম। সে দুটো হাউইয়ের মতো ফেটে আমার মগজের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। তিনি আসছেন! এখানে আসছেন! আবার তাঁকে

দেখবো। একথা যে কখনও কল্পনা করতে পারি নি। বিশ্বাস হচ্ছিল না। গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছিল, কথা বেরুচ্ছিল না।

মোটা ব'কে যাচ্ছিল, "যার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে না, তাকে আমি চিনি। নাচ-টাচ্ সাঙ্গ হ'লে ওদের দলে গিয়ে ভিড়বো।"

আমি নির্বাক। ওর ওই হেঁড়ে গলা আর মাংসের ঢিপি বপু নিয়ে ওযে ইসাডোরা ডানকানের কাছে যাবে, একথা ভাবতেই আমার পিত্তি জ্ব'লে যাচ্ছিল।

তারপর ও বললো "জীবনে একবারও বড় কাউকে যদি দেখতে চাও, তোমায় সঙ্গে নিতে পারি।"

আমি শান্ত হয়ে গেলাম। মনটা তখনও স্তম্ভিত। একটু ঈর্ষার সঙ্গেই উত্তর দিলাম, "আচ্ছা, নিয়ে যেও আমায়।"

এবার প্রতীক্ষার পালা। খাওয়া ভুললাম, ঘুম ভুললাম। কাজে মন বসে না, পড়াশোনা চুলোয় গেল। দেখা হবে, দেখা হ'লে কি ঘটবে, এসব ভেবে-যে এমনটা হচ্ছিল, তা নয়। ইসাডোরা ডানকানের সম্পর্কে কিছু ভাবছিলাম, তাও বলা চলে না। কিছুই ভাবছিলাম না, সমস্ত জীবন যেন একটা প্রতীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর, একদিন মোটা এসে জানালো,—"সব ঠিক ক'রে এসেছি। নাচ হয়ে গেলে আমরা ডানকানের সাজঘরে যাবো। কিন্তু—এমন ভাবে তো তোমার সেখানে যাওয়া চলতে পারে না।"

সে আমার পোষাকের দিকে একদৃষ্টে তাকাচ্ছিল। একটা নির্বোধ লজ্জায় আমার মাথাটা হেঁট হয়ে গেল, বললাম,—"সে তো নিশ্চয়।"

"যা প'রে আছ, তার উপর একটা কোট চড়িয়ে নিলেই চলবে।"

ও চ'লে যাবার পর, আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম। ব্যাপারটা বুঝলে? এ পর্যন্ত ভেবে এসেছি, আমি ইসাডোরাকে দেখবো, ইসাডোরাও

যে আমায় দেখতে পারেন, এ খেয়ালটা হয়নি। এখন পরিষ্কার বুঝলাম, এই জীর্ণ, তালিমারা, হাত-ছোট পোষাক প'রে আমি তাঁর সামনে যেতে পারবো না। ভাবতে লাগলাম, কার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার পেতে পারি? নাঃ, ছাত্রদের মধ্যে যাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা, তাদের সবারই অবস্থা আমারই মতো, রাত্রে খেটে, দিনের বেলাকার পড়াশুনার খরচ চালায়। আর চাষীদের যাদিকে জানি, তারা তো মাস গেলে কয়েক টাকা মাত্র উপায় করে।

নিজের মালপত্র যা ছিল, সেগুলোর উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। বাড়ী থেকে আনা এটা-সেটার মধ্যে একটী মাত্র দামী জিনিষ—সোনার উপর এনামেল করা একটী ছোট্ট মূর্তি। মা মারা যাওয়ার আগে এটা দিয়ে বলেছিল,—"যদি কখনও একান্ত অভাবে পড়িস।" অনেকক্ষণ মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর সেটাকে গামছায় বেঁধে নিয়ে বেরুলাম বাজারের দিকে।

সেটা বিক্রী করার আশায় সমস্ত দিন দোকানে দোকানে ঘুরলাম। কেউ একটা কোটের দামে সেটা কিনতে চাইল না। রাতের মুখে নদীর ধার দিয়ে বাড়ী ফিরছি, একটা দোকান নজরে পড়লো। পড়তি অবস্থায় লোকে যে সব দোকানে টুকিটাকি জিনিষ বিক্রী ক'রে আসে, সেই রকমের একটী দোকান। দেখলাম, একটা কোট ঝুল্‌ছে, নতুন নয়, দু'এক জায়গায় একটু-আধটু ফুঁসি উঠে গিয়েছে, কিন্তু জিনিষটা ভাল। চমৎকার কাল "ফারের কলার।" দেখে লোভ হ'ল। শরীর কাঁপতে লাগলো। জানি এটা আমার হবেই, তবু, প্রথমটা আর পাঁচটা জিনিষ দেখার ভাণ করলাম। খানিক বাদে তাচ্ছিল্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম "আর ঐ পুরানো কোটটার দাম?"

দোকানদার চ'টে গেল। "পুরানো কোট বৈকি! এমন খাসা কোট—

কারের কলার। এর দাম হবে একশো রুবল।" আমি এবার মূর্তিটা বের করলাম।—" ঐ কোটটার বদলে এইটা দিতে পারি। দর কষাকষি রাখো, আমি কিনতে এসেছি, দর করতে নয়।"

দোকানী মূর্তিটা নিয়ে এনামেলের উপর হাত ঘষলো, নখের টোকা দিয়ে ঠুন্‌কো কিনা পরখ করলো, আলোর কাছে ধ'রে সোনা থাকা সত্ত্বেও ওর মধ্যে দিয়ে আলো বয় কিনা দেখে নিল। তারপর বললো—"লোকসান হবে। তা আমি মধ্যে মধ্যে দয়াধর্ম ক'রে একটু ছাড় ছুড় দিই। আচ্ছা, নিয়ে যাও কোট।"

কেমন ক'রে সেখানে গিয়ে পৌঁছুলাম, সে কথাটা আর নাই জিজ্ঞাসা করলে। এইটুকু জান্‌লেই হ'ল, সেখানে গিয়ে পৌঁছুলাম। কদিন ধ'রে বুকটা কেবলি দুর দুর করছিল, সেখানে যেতে শান্ত হ'ল। আমরা একটা ছোট কামরায় এসে ঢুকলাম। ও-পাশের দরজা দিয়ে অনেকের গলা আর হাসির শব্দ ভেসে আসছিল, কে একজন গান গাইছিল। মাঝের কামরায় আসতে এক বৃদ্ধা আমাদের টুপি নিয়ে রাখল। সে আমার কোটটা নেবার জন্যে হাত বাড়াতে আমি মাথা নেড়ে জানালাম, না। অমনি সে হাঁই মাই ক'রে ফরাসী ভাষায় ঝড়ের বেগে কী-সব ব'কে যেতে লাগলো। "কেউ কোট নিয়ে ঘরে আসে, মাইজী এটা পছন্দ করেন না, একে ছোট ঘর, তার উপর ঐ সব কোট-টোট ঢোকালে একটা জবড়-জঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।" আমি হতাশ হয়ে বন্ধুর দিকে চাইলাম। সে তখন তার কোট ছেড়ে রেখে দরজার গোড়ায় অধীর হয়ে হাত কচলাচ্ছে, বিরক্তির স্বরে বললো,—"খুলেই রাখোনা বাপু। ওঁর চারপাশে কত বড় বড় লোক। তোমার দিকে ওঁর নজর পড়বে ভেবেছো?"

নিরুপায় হয়ে কোট খুলে রেখে জীর্ণবেশেই আমাকে আসতে হ'ল। ঘরে অনেক লোক। ইসাডোরা ডানকান একটা লম্বা কুসিব উপব অর্ধশায়িত। তাঁর চাবপাশে ফুলেব ছডাছডি। সকলেই তাঁর কাছে ভিড ক'রে আছে। দরজার কাছে একটা অন্ধকাব কোণে দাঁডিয়ে তাঁকে দেখতে লাগলাম। ব'সে আছেন, এত স্নিগ্ধ কোমলতা তাঁর মধ্যে। মনে হ'ল মৃদু মৃদু হাসছেন, সত্যি, তবু তাঁব নিখুঁত মুখখানায় কিসের যেন একটা বিষণ্ণতা। ভাবলাম, হয়তো শ্রান্ত হয়ে পডেছেন, এখন একটু বিশ্রামেব দবকার। সকলে তখন তাঁর কাছ ঘেঁসে দাঁডিয়ে, কেউ হাসছে, কেউ ওঁর হাতে চুমো খাচ্ছে। আমার বন্ধুটী বীয়াবেব মাত্রা একটু বেশী ক'রে এসে, তাঁর আদবেব কুকুব সেজে তাঁব কাছটীতে হামাগুডি দিচ্ছেন, আর তাই দেখে সবাই হেসে গডিয়ে পডছে। আমার এমন লজ্জা হ'ল।

ওঁর সুপুরুষ রুশীয় স্বামী তখন হাত দু'টো মুডে একপাশে দাঁডিয়ে ছিল, মনে হ'ল, ভদ্রলোক মনে মনে আমাদেব গাল পাডছে। পাডাইতো স্বাভাবিক। ষ্টেজেব উপব ওঁকে দেখে তৃপ্তি হ'লনা, লোভী ছেলেদেব মতো এখানে ভিড করতে এলাম। বুডীটা তখন একটাব পর একটা ফুলেব ঝুডি এনে ঘব ভ'বে ফেলছে, দেখতে দেখতে ঘরটা যেন ফুলেব বাগান হয়ে উঠলো। যতবাব সে ফুলেব ঝুডি নিয়ে আসে ইসাডোবাব মিষ্টি মিহি স্বরে ততবার উচ্চারিত হতে শুনি—"ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমার উপর আপনাদের অসীম অনুগ্রহ।" যাঁর কাছে আমাদেব ঋণেব তুলনা নাই তাঁরই মুখে এই ধন্যবাদ শুনে আমার বুকটা গর্বে স্ফীত হয়ে উঠছিল।

ইতিমধ্যে আরও লোক এসে তাঁকে ঘিবে দাঁডালো। আমি আব ওঁর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। নজরে পডছিল লম্বা কুসিটার কিনাবার উপর তাঁব সুদীর্ঘ সুন্দর হাতখানি। আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট ধরা, তার ছাই খসে পডলো মেঝের উপর পডে-থাকা একটা ফারের কম্বলে। ছাই পড়তে

দেখে আমার চেতনা হ'ল, কি যেন পোড়াব গন্ধ বেরুচ্ছে। মাথাটা ঘুরতে লাগলো। এক্ষুণি আগুন জ্ব'লে উঠবে, লেলিহান্ শিখা মেলবে, লোকগুলো চেঁচামেচি ক'বে ছুটোপুটি খেতে লাগবে, আব আমি?—আমি ওঁকে বাঁচাবো। তাইতো! মাথা ঠাণ্ডা রাখা চাই, উনি মেঝে থেকে চাব ধাপ উঁচুতে ব'সে আছেন, চাব পাশেব এই মূর্খগুলো একবাব বিপদ টেব্ পেলে ওব পথে বাধা হয়ে উঠবে। এদেবই আগে সরানো দবকাব।

"অনেকটা বাত হ'ল",—বলেই আমি চুপ ক'বে গেলাম। কথাটা কেমন বেথাপ্পা বোকাব-মতো শোনালো। সবাই একটু পিছনে স'বে হাঁ ক'রে আমাব দিকে চেয়ে বইলো, এতক্ষণ আমি চুপ ক'বে ছিলাম, আমি যে আছি, এটা কেউ লক্ষ্য কবেনি। এমন সময়, আমবা যে পথে এসেছিলাম সেদিকেব দবজা ঠেলে দমকা হাওয়াব মতো একবাশ ধোঁয়া ঢুকিয়ে বুড়ীটা ঘবে এসেই দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

"মাফ কবো, মাইজী, কোন ভদ্রলোকের পোষাক পুড়ে গেল।"

বুড়ী একটা আধ-পোড়া জামা মেলে ধবে উত্তেজিতভাবে অনর্গল বকে চললো: তাব কোনো দোষ নাই। পরে যারা এসেছেন, তাঁদেব কেউ ভুল ক'বে এটা টুলের উপব না রেখে কাঠ কয়লার চুল্লীব উপব ফেলে এসেছিলেন।

ইসাডোবা ডানকান আর্তকণ্ঠে ব'লে উঠলেন,—"কাব কোট এটা? আমাব বাড়ীতে কাব এতবড় ক্ষতি হয়ে গেল?"

মোটা হেসে গড়িয়ে পড়লো, হাসি আব থামে না, শেষ পর্যন্ত একজন তার চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে তবে হাসি থামায়। আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে হাসিব দমকার ফাঁকে ফাঁকে জানালো,—"ঐ যে ওর। সে এক মজাব কথা! জানেন, আজকে এখানে আসার উপলক্ষেই ওটা কেনা হয়েছিল।"

আমি উদাসীনভাবে বললাম,—"বেশী কিছু দামী নয়। পুড়ে গেছে, চুকে গিয়েছে। কোটের তো আমার দরকার হয় না।"

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। তারপর ইসাডোরা ডানকান আসন ছেড়ে উঠলেন, আমার কাছে নেমে এসে বললেন,—"বন্ধু, যদি অনুমতি দেন, আপনার জন্যে আমি নাচবো।" তারপর বোঁ ক'রে চারপাশ ঘু'রে আঙুল মটকে সকলকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, "এ তোমাদের জন্যে নয়! তোমরা চলে যেতে পারো, দেওয়ালেব গায়ে চিপটে লেগে থাকতে পারো, অনর্থক হল্লা ক'রে হাততালি দিয়ে বিবক্ত কোবো না। এখন বা পবে, একটা কথাও বলতে চেয়ো না। এখনকার নাচ শুধু আমাদের দুজনের মধ্যে।"

তিনি পা থেকে চটি খু'লে ফেললেন। রূপালি উডানিটা আলগা ক'রে দিতে তাঁর পায়ের চতুর্দিকে পড়ে সেটা ঝলমল কবতে লাগলো। একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে তিনি খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। তাবপব নৃত্য সুরু হ'ল।

অন্ধকারে পা চালিয়ে বেরিয়ে আসছি, মোটা আমার সঙ্গ নিল। বেচারা হাঁফাচ্ছিল, ওব মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ছিল। বকতে লাগলো—"বাঃ বেশ কাণ্ডটা কবলে যা হোক্‌। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ ব'লে বসা হ'ল, অনেক বাত হয়ে গিয়েছে। তখন আবার বললে, কোটেব আমাব দরকার হয় না। তাবপর, অতবড একজন নর্তকী উনি, তা যদি বুঝতে—উনি ভদ্রতা ক'রে আমাদের খাতিবে যখন নাচলেন, একটা ধন্যবাদ করা নাই, হস্তচুম্বন নাই, পাথরের মতো হাঁ ক'বে চেয়ে থেকে, বাডী থেকে বেবিয়েই এক ছুট।"

আমি জোরে জোরে হাঁটতে লাগলাম, অন্ধকারে এক ফাঁকে ওকে এড়িয়ে যাবার আশায়। ও কিন্তু না-ছোড-বান্দা। "ওঁকে ফুল পাঠানো হ'ল না ব'লে আমি এত লজ্জিত হলাম। ফুল পাঠানোটা একান্ত উচিত ছিল।"

আমি বললাম,—"কেন? ওঁর তো যথেষ্ট ফুল এসেছিল, আর কেন?"

শুনে ও রাগে গস্‌গস্‌ করতে লাগলো,—"কেন! যথেষ্ট ফুল এনেছিল! হা ভগবান, এমন গাধাও হয়! দয়া ক'রে স্মরণ রেখো আর কখনও আমি "

ওর গলা তখনও কানে আসছিল। চট ক'রে এক গলিতে ঢুকে পড়ায় আর শুনতে হ'ল না। একটা গির্জার বাইরে দাঁড়িয়ে তার দেওয়ালের দেবী-মূর্তিটার উপর জমে-বসা তুষার ঝাড়তে লাগলাম। মায়ের দেওয়া প্রতিমা বিক্রী করেছি ব'লে কোনো কষ্ট হচ্ছিল না। এককালে দেবতাদিকে দগ্ধ জীবের অঞ্জলি দেওয়া হ'ত, আমিও দগ্ধ অঞ্জলি দিয়ে এলাম। *

---

* মার্কিন গল্প—হেলি ফ্লানাগান

—পতিত জমি

বসন্তের প্রারম্ভ। উত্তর চীনে তখনও বেশ শীত। বিরাট ঊষর প্রান্তর সমস্ত শীতকালটা ঝড়ে বরফপাতে জীর্ণ হয়ে পূর্বদিকের সুদূর গিরিশ্রেণীর পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রভাতে উৎকুন-প্রপীড়িত লোমওঠা ঘেয়ো কুকুরের মতো হতশ্রী ঐ প্রান্তরটাকে উত্তাপ দিতে 'স্ফটিকচূড়' পর্বতের গা বেয়ে রৌদ্র নেমে আসে। সন্ধ্যায় বয়ে আসে তীক্ষ্ম উত্তুরে হাওয়া, ঘুমভাঙা মাটীর সঙ্গে স্বর মিলিয়ে আর্তধ্বনি ক'রে।

এই মাটী নিয়ে সে কি করবে, মা-চু-চাং বুঝতে পারে না,—এ জমিতে চাষ দেওয়া চলে?

বসন্ত উৎসবের সময় লিউ-তা-স্থং সরকারী দপ্তর থেকে তার জন্য অনুমতিপত্র আনিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘকায় ছিপছিপে জোয়ান মা-চু-চাং, এখানে এসেছে পতিত জমিতে সোনা ফলাবার স্বপ্ন নিয়ে। সঙ্গে এসেছে তা-স্থং, লাঙ্গল, নিড়ানি।

ধ্বসে-যাওয়া কন্‌ফুসিয়াস্ মন্দিরের ইষ্টকস্তূপের আশেপাশে ঘুরতে ঘুরতে লিউ-তা-স্থং একটা দীর্ঘ প্রস্তরখণ্ডের উপর লাফিয়ে উঠে উত্তেজনায় হাত নেড়ে ব'লে ওঠে, "এই জমিটাতেই আমরা লাঙল দেবো, ফসল হবে, শাকশব্জী হবে। আর ঐ পাহাড়টার গুহায় বেশ রাত কাটানো চলবে।"

তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে তক্ষুণি সে মাটী পরীক্ষায় লাগলো। মা-চু-চাং তার পিছনে পিছনে। লিউ-তা-স্থং-এর চোখে মুখে হাসি। মা তার সঙ্গে না হেসে থাকতে পারে না, রাগও হয় তার উপর।

মা ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠে, ঈষৎ-ন্যুব্জ পিঠটা ফিরিয়ে পূর্বদিকে চায়। ইট সুরকির স্তূপের মধ্যে একখানা ভাঙা দেওয়াল। তার দক্ষিণ পাশে ইতস্ততঃ কয়েকটা কবর। কেউ ওগুলোর তদারক করে না। উত্তর দিকটায় একটা প্যাগোডা ভেঙে পড়ছে।

"এই হ'ল গে পোড়ো জমি।"—গুহার দরজার দিকে মন্থর পদে চলতে চলতে মা-চু-চাং কত কি ভাবে।

* * *

"তোমার মালপত্তর ভিতরে তোলো।" মা-চু-চাং নীড় বাঁধে।

প্রথম দিন সকাল বেলা মা ধীরে-সুস্থে বিছানা থেকে ওঠে। মনটা বিষণ্ণ। সারাদিন সে ব'সে ব'সে তামাক ফোঁকে। সঙ্গীরা বোঝায়, মা বুকে জোর পায় না। চোখ ঝলসানো সূর্যালোকেও তার মনের কালিমা কাটে না।

পাহাড়ের ঢালু পথ ধ'রে একজন কাজে যাচ্ছে। বেশ বেঁটে খাট গোছের লোকটি। পরণে সূতী কামিজ, প্যাংলুনটা কালো কোমরবন্ধ দিয়ে আঁটা।

পাহাড়ের গায়ে প্রচুর গুল্মলতা, সেগুলো কেটে সে জ্বালানি সংগ্রহ করে। ঠাণ্ডা হাওয়া বয়, তার বেণী দুলে ওঠে, মাথায় টুপি নাই।

"ইস্ কি ঠাণ্ডা।"

বেচারীর নিশ্বাসে বাষ্প বের হয়। জোরে জোরে সে গুঁড়ির ওপর কুড়ুল চালায়। সমস্ত উপত্যকা প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

মা-চু-চাং ব'সে ব'সে অন্যদের খাটতে দেখে। কাজে লাগার প্রেরণা পায় না। জলখাবার বেলা লিউ-তা-স্থং গুহায় ফেরে, ঘাড়ে এক বস্তা চাল, হাতে এক

চুপড়ি আলু। দীর্ঘ খাড়াই পাহাড় ভেঙে এসে সে হাঁফায়, কপাল হ'তে ঘাম ঝরে।

মা-র ইচ্ছা হয় বলে, "কাজ করবার আমার একটুও উৎসাহ নাই। এ পতিত জমিতে চাষ হবে, না ঢেঁকি!"

তবু সে চুপ ক'রেই থাকে। লিউ-তা-স্থং ঘাড়ের বোঝা নামিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসে।

বরফ গলে। পাহাড় বেয়ে তুষার-শীতল জল কলধ্বনি ক'রে নেমে আসে। সারা উপত্যকায় সূর্যদেব সোনা ছড়িয়ে দেন। গুহার দরজায় রৌদ্র হাসে।

লিউ-তা-স্থং হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলে, "সরকার আমাদিগকে উৎসাহ দিচ্ছে! 'বিলি বিভাগ' থেকে এখন হ'তে আমরা ময়দার রসদ পাবো! এবার থেকে হপ্তায় দু'দিন মেমো আর মাংস পাওয়া যাবে!"

মা-চু-চাং উঠে বসে, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, "কি বল্‌লে, মাংস?"

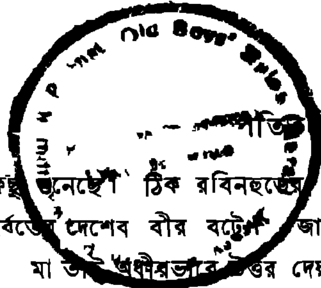
"হাঁ, সরকার আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে। আমরা যে শ্রমিক!"

য়েনানে আসার আগে মা-চু-চাং মিচি জেলায় এক জমিদারের জন্যে অনুর্বর জমি চষতো। জমিদারটি ছিলেন দারুণ স্বার্থপর, মজুরদের জন্যে খাদ্য বরাদ্দ ছিল, শুধু ভুট্টা, মাংস তো দূরের কথা। মজুররা যাতে খেতে কম পাবে, কর্ত্রী ঠাকুরুণ আবার মাঝে মাঝে ভুট্টার আটায় বালির ভেজাল মেশাতেন।

এখন এই লিউ পাগলটা বলে কি! নাঃ, এ একেবারে অবিশ্বাস্য!

লিউ-তা-স্থং বলে যায়, "এই প্রত্যন্ত ভূমিতে সবাই সমান ব্যবহার পায়। মাও-ৎসে-তুং আমাদের দেশনায়ক, তবু আমরা যা খাই, সেও তাই খায়।"

মাও-এর নাম শুন্‌লে মা-চু-চাং-এর মনটা আনন্দে কেমন যেন শিউরে ওঠে। মিচি জেলায় ক্ষেতমজুরী করবার সময় এই লোকটার কাহিনী সে



কিছু কিছু শুনেছো। ঠিক রবিনহুডের মতো তেপান্তরের মাঠ আর তুষার ঢাকা পর্বতের দেশেব বীর বটে। জাপানী ভূতগুলোকে কেমন হুড়োটা দিচ্ছে। মা তাই অধীরভাবে উত্তর দেয়, “জানি জানি যাও আমাদের—এই সাধাবণ লোকদেব—মুক্তিদাতা।”

*   *   *

এই আলসে লোকটার ঘুমেব ঘোর কাটতে থাকে। লিউ-তা-সুং ব'লে চলে, এখানে জমি কেমন ভাল, কোন্ কোন্ জিনিষ জন্মাতে পারে—এই সব কথা। জমিব কথা কানে পৌছুতেই মা-চু-চাং-এব মুখ নীচু হয়। এখানকাব জমিব উপব তাব আস্থা নাই।

লিউ বলে, “মাস তিনেক পবে আমাদের তরিতরকাবী যা দবকার এখানকার জমি থেকেই পাবো।”

“হুঁ, তা দেখা যাবে।”

“তা কাজকর্ম তো ভালই বোঝো, পাকা লোক তুমি। লেগে যাও না কেন?”

মা একথাব জবাব দেয় না, আপন মনে বিডবিড করে। হুঁ, এই বাঁজা পাথুরে জমিতে সোনাই ফলবে বটে, ভাত জোটে না, ভাতাব চায়! বাক্‌চাতুবী কেবল!

পাহাডের ঢালু বেয়ে মা পাহাড থেকে নীচে নামে, জমি নিডায়।

“জমিতে কে কত ফলাতে পারে, তার প্রতিযোগিতা হচ্ছে এবার, শুনেছো?” —হৃষ্টপুষ্ট বেটে লোকটা প্রবল উৎসাহে নিডানি চালাতে চালাতে মাকে জিজ্ঞাসা করে, “শুনেছো?” —মা একটা উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না।

পাহাড়ের গা বেয়ে এক ঝাপ্টা ঠাণ্ডা হাওয়া ব'য়ে যায়। ঢিপি আর কবরগুলোব উপর মরা ঘাস খস্‌খসিয়ে ওঠে, যেন তাদের একান্ত নির্জনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়।

কম পাথুরে দেখে একটুকরো জমি মা বেছে নেয়। মিনিট কয়েকের মধ্যেই কিন্তু নিড়ানি ছেড়ে হাত গুটিয়ে বসে। চারপাশে শুধু আগাছা—আর আগাছা, কার সাধ্য সাফ করে।

মা-চু-চাং সমস্ত প্রান্তরটা চ'ষে বেড়ায়। এ মাটীতে কোনোদিন লাঙল পড়ে নাই। কুমারী মৃত্তিকার মৃদু গন্ধে নাসারন্ধ্র ভ'রে ওঠে, মনে হয়, কী যেন তার বুকের উপর চেপে বস্‌ছে।

কর্ষণ-যোগ্য একটু জমির সন্ধান তবু সে করে। সর্বত্রই ঐ পাথর আর পাহাড়। মা-চু-চাং সবিস্ময়ে ভাবে, এ পতিত জমি চষতে চাওয়া কেন?

তার চোখে ফুটে ওঠে অবিশ্বাস, ঠোঁটের দুকোণ নেমে আসে। বেঁটেখাট লোকটা বিস্মিত হয়ে মা-কে শুধায়, "হয়েছে কি তোমার, বলো তো?" মা ঐ এতটুকু লোকটার দিকে বিদ্রূপভরা চোখে একবার চায়, চুপ ক'রে থাকে। সন্ধ্যা নাগে। ইতস্ততঃ ছড়ানো ছোট্ট ছোট্ট অনুর্বর ক্ষেতগুলো দীর্ঘকায় পাহাড়ের গুটি-গুটি এগিয়ে-আসা ছায়ার বুকে মুখ লুকায়।

গুহার বাইরে পাথরের বেঞ্চিতে ব'সে সকলে জটলা করে, তামাক টানে, তাদের কথাবার্তা হাওয়ার পিঠে চ'ড়ে দেশদেশান্তরে উড়ে যায়।

লিউ-তা-সুং সাদা ময়দা নিয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফেরে। প্রদীপের মিট্‌মিটে আলোতে মা তার দিকে চায়, মেঝের ওপর থুতু ফেলে, কোনও কথা বলে না।

"লিউ-তা-সুংটা বড় বোকা, যত উদ্ভট জিনিষে তার অগাধ বিশ্বাস।"

মা মনে মনে এমনিধারা লিউ-এর সমালোচনা করে। লিউ-যে প্রকৃতপক্ষে কেমন লোক, সে খবরও সে রাখে না।

"একটা ডাণ্ডার উপর একখানা মাথা! কি কাজটা ও করতে পারে?"

মা জানে না, এই লিউ একদিন তার মতো কত হাজার লোকের সঙ্গে কত পাহাড় প্রান্তর ভেঙে দশহাজার "লি" একটানা মার্চ ক'রে এসেছে, বরফ

মানে নাই, ক্ষুধাতৃষ্ণা উপেক্ষা করেছে। আজ তার সমস্ত সামরিক প্রেরণা ও শক্তি কেন্দ্রিত হয়েছে উত্তব সানসী প্রদেশেব এই বাঁজা মাটীকে ফলিয়ে তুলবার দুরূহ তপস্যায়।

"লাঙল হোক্, বন্দুক হোক্, হাত ওর সমান পাকা"—বেঁটে লোকটা লিউ-এর সম্বন্ধে মা-কে বোঝায়। এমন সময় লিউ সেদিকে আসে। বেঁটে লোকটা মা-কে বলে, "কমরেড্ মা, এ মাটী সত্যিই খুব ভাল! শাকসজী যা ফলবে!"

মা বিদ্রূপ কবে, "হাঁ, তা ভগবানই জানেন।" লোকটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খায়, বলে, "তা যাই বলো, এ জমি সত্যিই খুব উর্বরা।"

(২)

একটু একটু ক'রে গবম পড়ে। পাহাড়েব বুক-বেয়ে তর্‌তর্‌ ক'বে জলস্রোত নামে, সূর্যের উজ্জ্বল আলোকে ঝিলমিল করে। যেন্ নদীর স্মিতহাস্যে সমস্ত অঞ্চল আলো হয়ে ওঠে। মেঘেব রঙ বদলায়। গাছে গাছে নূতন পাতা গজায়, মুকুল আসে। উর্ধ্ব আকাশে বসন্ত-সখাব সঙ্গীত উপ্‌চে পড়ে।

লিউ-তা-সুং বেঁটেখাট লোকটীব পাশে এসে দাঁড়ায়। "কমরেড্ ৎসাও, তুমি যে জমিটা সাফ্ করছো, ওর মাটী বেশ ভাল, না?" "ঠিক্", ৎসাও বেশ একটু গর্বেব সঙ্গে উত্তব দেয়, "ঠিক্, খুব উর্বব, এ জমিতে ভুট্টা যা হবে! ইয়া মোটা আব ইয়া লম্বা!"

বিকালেব মুখে মা ভাঙা দেওয়ালটার কাছে এসে দাঁড়ায়। ৎসাও ওখানে চাষ দিয়েছে। চমৎকার সোঁতা রাঙা মাটী! মা একমুঠো তুলে শোঁকে,

আঙুল দিয়ে চট্‌কায়। মাটীতে একটা সুপরিচিত গন্ধ!—ঘোড়ার নাদির সার দেওয়া হয়েছে।

মা-র মনে খট্‌কা লাগে,—এই বাঁজা জমি হয়তো ফল্‌তেও পারে। আবার মনে হয়, নাঃ, তাও কি সম্ভব?

লিউ-তা-সুং নিড়ানি ঘাড়ে সে দিকে আসে। কাউলিয়াং শাখার মতো দীর্ঘ ঋজু দেহ। গাম্ভীর্যময় মুখখানিতে খুসমেজাজী হাসি।

লিউ ডাক দিয়ে বলে, "কমরেড্ মা, মাটীটা বেশ ভাল মনে হচ্ছে না? খুব ফল্‌বে।"

মা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। "বড় পাথুরে, পাথরে একেবারে ভর্তি।" ৎসাও একথার জবাব দেয়, "প্রবাদ আছে, লাঙলের ফাল ঘ'সে সুচ করা যায়। পাথুরে জমিকে আমরা আবাদী করতে পারবো না?" কথা শেষ ক'রে সে আবার আগাছা সাফ করতে লাগে।

চুপ ক'রে একপাশে স'রে দাঁড়িয়ে থাকতে মা-র কেমন লজ্জা করে। লিউএর সঙ্গে সে পাথর খুঁড়তে সুরু করে।

"কমরেড্ মা, পীচ্-বনটার ইতিহাস জানো?" "শুনেছি।" মা-র কণ্ঠস্বরে নির্লিপ্তভাব বেশ স্পষ্ট।

"ওটাও এককালে এমনি বাঁজা জমি ছিল। আর কিছুদিনে সেখানে মুকুল ধরবে।"

মা সন্দেহ প্রকাশ করে, "ওখানে অনেককাল হ'তে পীচ গাছ ছিল, শুনেছি।"

"না, ছিল না। আমি বলছি ওটা এককালে পতিত্ জমি ছিল।" মা সাড়া দেয় না।

কমরেডদের একজন, বুড়ো কিষাণ ওয়াংফা মুখ বুজে কঠিন পরিশ্রম ক'রে যায়, পাকা চুল, মুখে অসংখ্য তিল।

সমস্ত নিস্তব্ধ। বাসন্তী ধরণী হেসে আকাশের হাসির উত্তর দিচ্ছে। শীত চলে গিয়েছে।

লিউ পীচ্‌বনের কাহিনী শোনায়, কেমন ক'রে পতিত জমির রূপান্তর ঘট্‌লো, এখন সেখানে কেমন ক'রে যন্ত্র চালিয়ে আবাদ দেওয়া হচ্ছে। মা-র মুখে একটু হাসি ফোটে, সে সাগ্রহে শোনে, বলে, "আমাদের যদি ঐ রকম যন্ত্র থাকত ”

"না, আমাদের জমি এখনো যন্ত্র চালানর উপযুক্ত হয়নি।"

"কবে আমাদের যন্ত্র আসবে?"

"আসবে একদিন।"

মা আবার চুপ ক'রে যায়। আসবে একদিন! তার বিরক্তি ধরে। মিচি জেলায় সে যখন কাজ করতো, জমিদারটাও তাকে এই রকম স্তোক-বাক্য শুনিয়েছে অনেক। "খুব খাট্, তোর একটা বৌ জুটিয়ে দেবো! শীতের রাত্রে বিছানা গরম পাবি।"

মা মনে মনে অভিশাপ দেয়। ভবিষ্যৎ চুলোয় যাক্। এ জীবনে বৌ কোনোদিন জুট্‌বে না। ভবিষ্যতের কথা ব'লে লোকে শুধু ধাপ্পা মারে। জমিদার মা-কে বলেছিল মাইনের টাকা তার কাছে জমা রাখতে। মা তাই রেখেছিল। কিছুদিন পর টাকা ফেরৎ চাইলে জমিদার ঝেড়ে জবাব দেয়, টাকা দেবো না। চটে গিয়ে মা তার সঙ্গে বচসা সুরু করে, উত্তেজনায় হাত ছুঁড়তে গিয়ে একটা কলস ভেঙে ফেলে, আর এই অপরাধে তার কাজে জবাব হয়ে যায়। ভাবতে ভাবতে মা-র মেজাজ গরম হয়ে ওঠে:

"যে শালা লম্বা লম্বা কথা বলে, তার জাতের ঠিক নাই।" লিউ বলে, "এ জমি চষ্‌বার জন্যে যন্ত্রপাতি আমরা পাবো একদিন, তবে এখন নয়। এখন আমাদের যুদ্ধ চালাতে হচ্ছে।"

কথাটা সত্যি। মা লড়াইএর খবর জিজ্ঞাসা করে, গল্প শুনতে চায়। লিউ

তাকে পিন্‌সিংকোয়ানের প্রথম লড়াইএর কাহিনী শোনায়,—চীনের চাষীরা জাপানীদের সঙ্গে কেমন যুদ্ধ করেছিল, তার কাহিনী।

শুন্‌তে শুন্‌তে মা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তার চোখ দুটো ঝক্‌ ঝক্‌ করে। চট্‌পট তার নিড়ানি সরে, ক্ষিপ্রগতিতে সে পাথর তোলে, ভাঙা খোলা, ইট-পাটকেল উপড়ে যায়।

ৎসাও চীৎকার ক'রে বলে, "একজোটে হাত লাগাও ভাই, জাপানী ভূতগুলোকে না ভাগিয়ে শান্তি নাই।"

(৩)

লিউ-তা-সুং আর মা-চু-চাং সব সময় এক সঙ্গে কাজ করে। ভাঙা দুর্গের কাছে জমিটায় আগাছা সাফ করা হয়েছে, ভাল ক'রে চষাও হয়েছে। তার পূর্বদিকে পুরাণো মন্দিরের ধ্বংসস্তূপটার পাশে ৎসাও জমি থেকে সরানো ভাঙা খোলা টালি প্রভৃতির একটা পাহাড় খাড়া করেছে। বয়স তার কম, মনটা সদাপ্রফুল্ল, কাজ করতে করতে গান করে। ওয়াং-ফা কিন্তু নীরব, —শীতে-জমা স্রোতস্বতীর মতো। মাথা হেঁট ক'রে সে কাজ ক'রে যায়, ক্বচিৎ কখনো একটু মুখ মুচকে হাসে।

লিউ এখন মহিষের পিছন পিছন লাঙল ঠেলে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। ছোট হালকা মেঘ পাহাড়ের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। উপত্যকার বুকে ছোট ছোট জলস্রোত কুলকুল শব্দে নেচে চলেছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সোনালি রৌদ্র ভেঙে পড়েছে।

হাওয়ায় বসন্ত ঋতুর সৌরভ। মাটি দেখে চাষীঘরের মেয়ের গাল মনে পড়ে, নরম, কিন্তু থস্‌থসে নয়। ঘুরে ঘুরে লিউ-এর পায়ের তলা চুলকায়। উপত্যকায় পীচ্‌ গাছগুলোয় ঝাঁক ঝাঁক মউল এসেছে।

"অর্-র্-র্"—লিউ মহিষ ডাকায়। রৌদ্রে দেহে ঘাম ঝরে।

মা লিউএর লাঙল দেওয়া দেখে। মহিষটা ঘাড উ'চিয়ে লাঙল টানে, মা চেয়ে থাকে। ফালে পাথব ঠেকে। ফাল ভেঙেছে, এই ভয়ে লিউ লাঙল তুলে ধবে। মহিষটা হঠাৎ একটা হেঁচ্কা টান মাবে। লিউ কাদায় গডাডডি যায়।

"দাও, আমি ধরি।" মা দৌডে গিয়ে লিউকে ওঠায়। লাঙল আর পাচনবাডি নিয়ে মা কাজে লাগে।

ফালের মুখে নরম ঢিলে মাটি দুফাঁক হয়ে যায়। মহিষ দ্রুত এগিয়ে চলে। পাকা চাষীব হাতে মা লাঙলেব মুঠো ধরে। লিউ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য লক্ষ্য করে, ' কমরেড্ মা, জমির কাজে তুমি ওস্তাদ।"

"না না," মা হঠাৎ কেতাদুরুস্ত হয়ে ওঠে, বলে "তবে কি জানো, জমিদাবের কাজ কববাব সময় দিনে দু'বিঘে জমিতে হেসে খেলে লাঙল দিয়েছি।"

পাহাডেব নীচে, গোবস্থানের কাছে, জন বাবো লোক একটা পাৎকুয়ো খোঁডে। তারা কাজ কবে আব গান গায়ঃ—

সব দরিয়াব চাইতে রে পীত্—পীত্ দরিয়ার জল।
'চাও'-সহরে পডেছে কাল জাপ্ ডাকাতের দল।
ওখাং গাঁটাও পুডছে শুনি।—আম্রা কি দুর্বল?
চীন সেনারা হট্ছে পিছে,—হাড জ্বলে যায় রাগে—
বাপদাদাবা শুকিয়ে জোগায় অন্ন তাদের আগে।
মরুলে ফেলে উপত্যকায়, লড়্ছে মর্দ্দ্ কুলি।
আর সওয়া নয়, হে'ইও রে ভাই, আন্ বন্দুক গুলী। "

মা তাদের ভাঙা মোটা গলাব গান শুনে বিচলিত হয়ে ওঠে।

"কমরেড্ লিউ, যুদ্ধের খবর কি?"

"আমরা শত্রুব্যূহ ভেদ করেছি।"

"কি? কি?"

"উংতাই পর্বত অঞ্চলে আমাদের চোরাগুপ্তি সৈন্য অনেক বেড়েছে এখন। পশ্চিম সান্‌সীতে একটা নূতন সৈন্যদল গড়ে উঠ্‌ছে। আমাদের ঘোড়-সওয়াররা পেইপিংএর উপকণ্ঠে প্রায়ই খণ্ডযুদ্ধে জাপানীদের উত্যক্ত ক'রে রাখে।"

"জাপরা ভয় পায় না?"

"পাবে না কেন? আমাদের সেনারা পিছন থেকে ওদের উপর পড়ে, ওদের বিপর্যস্ত করে। জাপরা তাদের কি ক'রবে?"

"মরুক্ শালারা। ইচ্ছে হয়, জাপ্ ভূতগুলোকে একটু শিক্ষা দিয়ে আসি।"—মা যুদ্ধের খবর পেলে আনন্দে হেসে ওঠে।

"যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লড়াই করার চেয়ে এখানে চাষ ক'রে, কলকারখানা চালিয়ে, লড়্‌বার শক্তি জোগানো কিছু কম বড় কাজ নয়, কমরেড্ মা।'

* * *

মানুষের কণ্ঠস্বরে, পশুর ডাকে উপত্যকা মুখর হয়ে থাকে। এখানকার সকল চাষীই বাসন্তী কৃষিপ্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে।

লিউ-তা-সুং জোর গলায় হাঁক ছাড়ে: "সৈন্যদের খাদ্য জোগাতে হবে, সবাই খুব খাটো ভাই।" সমস্ত উপত্যকা তার কণ্ঠস্বরে গম্‌গম্ করে।

মা-র হঠাৎ মনে পড়ে লিউ-এর সেই কথাগুলো: চাষ দিতে পারলে এই পোড়ো জমিতেই সোনা ফল্‌বে।

মা এক রিঘে জমিতে লাঙল দেওয়া শেষ করে, ৎসাও ডাকে, ঘাসের উপর শুয়ে, তামাক খেতে খেতে দুজনে গল্প করে।

"ওয়াং-ফা এদিকে এসো না।"

ওয়াং-ফা আসে, মুখে একটা মৃদু হাসি।

ৎসাও তাকে জিজ্ঞাসা করে, আহ্-পোর কোনো চিঠি পেয়েছ নাকি? আহ্-পো বন্ধুলোক, এখন যুদ্ধ করছে।

"পেয়েছি চিঠি। খুব লড়ছে মরদ্। এক জাপভূতকে টেনে রেলগাড়ী থেকে নামিয়ে" ওয়াং-ফা চিঠির সারাংশ শোনায়—সেদিন রাত্রে চীনা গেরিলা বাহিনী একখানা জাপানী সাঁজোয়া ট্রেণ কেমন ক'রে থামিয়েছিল, তার বিবরণ।

(৪)

লিউ-তা-সুং গোটাকয় হাঁস ও বাচ্চা মুরগী, আর দুটো ধব্‌ধবে শাদা মেষ কিনে আনে। পাহাড়ের নীচের পুকুরে হাঁসগুলো সাঁতার দেয়। পুকুর-পাড়ে বাচ্চা মুরগীগুলো খাদ্য খুঁটে বেড়ায়। মাঝে মাঝে হাঁসগুলো তাদের পুকুরে নামতে ডাকে। মুরগী ছানাগুলো কিন্তু বেশ চালাক, হাঁসগুলো লোভ দেখাতেই, তারা চট্‌পট্ উড়ে পালায়। ভেড়া দুটো সকাল-সন্ধ্যা চড়ে বেড়ায়।

ব্যা-ব্যা! মা ভেড়াদুটোর পিঠের নরম পশমের উপর হাত বুলিয়ে আদর করে। "দোস্ত! বোপাটা শেষ হতে যা দেরী, তোদের জন্যে কটা ভেড়ী এনে দেবো। বাচ্চা নইলে ভাল দেখায়?" পশু দুটো এমনভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে! ওরা যেন বুঝতে পারে। মা-র হৃদয়টা হাল্কা বোধ হয়। সে তার দেশোয়ালী গান ধরে। এই ছোট ছোট জন্তুগুলোর উপর তার কেমন মায়া হয়। কেন, সে তা বুঝ্‌তে পারে না।

জমির সমস্ত আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে। পাথর সরাবার কিংবা ছোট ছোট গর্তগুলো ভর্তি করবার সময় যা মনে হ'ত, মা-র এখন তা স্মরণ হয় না। সে নিজের মনে ভাবে। অদ্ভুত কিন্তু, মা-চু-চাং এককালে এ জমিকে রীতিমতো ঘৃণা করতো, এখন এত ভাল লাগে কেন?

মা মাথা চুলকায়, এব জবার খুঁজে পায় না।

লিউ-তা-স্থং আগের চেয়ে ব্যস্ত, উজান-নদীব মাঝিব মতো পবিশ্রম কবে। তাব কটা মুখ বোগা দেখায়, চোখ বসে গিয়েছে, তবু ও-দুটোয় সর্বদা কিসের একটা দীপ্তি। ৎসাও-কে আগেব চেয়েও প্রফুল্ল ও কর্মতৎপর মনে হয়, এখানে যায়, সেখানে যায়, জ্বালানিব জন্যে গুল্ম কাটে, গান গায়, বাচ্চা ঘোডার মতো দ্রুত গতিতে চলে, নিপুণ হাতে পাথর ওঠায়, আগাছা তোলে, অবকাশ মতো পাথব-ফাঁদে বুনো পাখী ধবে। ওয়াং-ফা কিন্তু আগেব মতোই নির্বাক, কেমন যেন একঘেঁয়ে ভাব। বুড়ো কিনা!

"কমবেড ওয়াং, বুড়ো হ'লে বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা নয়?"—মা বুড়োকে জিজ্ঞাসা ক'বে বসে।

"নিশ্চয় নয়। আগে জীবনধাবণ কবেছি গোণাগুন্তি কয়েজনেব জন্যে, এখন করছি দশেব জন্যে।"

"তার মানে?"

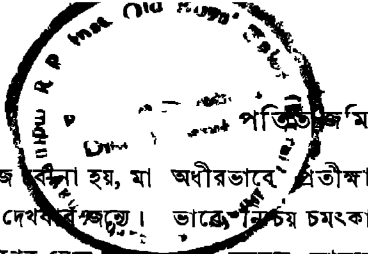
"আগে আমি দিন মজুব ছিলাম "

মা-ব মাথা গুলিয়ে যায়। এবা সবাই বলে, বেঁচে আছে দশেব জন্যে। সেও কি তাদের জন্যেই বাঁচ্‌ছে না? মা-র দিল্‌টা ভাল। সবাই জানে, তাব বৌ নাই, নিশ্চয়, সেও দেশেব ও দশেব জন্যেই প্রাণধারণ কবে, শুধু নিজের জন্যে নয়।

"এবাব বীজ বুন্‌তে হবে, বসন্তেবও আব শেষ হয়ে এল।"

"এবাব আবাব কিসের বীজ?"

"কেন, ভুট্টা, শণ আব খরমুজের।"—লিউ-তা-স্থং কোন্‌ সাবিতে কিসের বীজ বুন্‌তে হবে, দেখিয়ে দেয়। মা অনুমোদন কবে।



বীজ বোনা হয়, মা অধীরভাবে প্রতীক্ষা করে এ মাটীতে কেমন গাছ জন্মায় দেখবার জন্যে। ভাবে নিশ্চয় চমৎকাব হবে।

আগেব চেয়ে মা-কে এখন অনেক স্বাস্থ্যবান দেখায়, মুখখানা প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল, ঠোঁটে একটা বে-খাপ্পা ভাঁডসুলভ হাসি, আঁট-সাট দেহে মাংস লেগেছে।

লিউ-তা-স্থংকে অন্যত্র যেতে হচ্ছে, সেখানকার চাষবাসেব তদারক কবতে। মা এ সংবাদে বিষণ্ণ হয়, একগুঁয়েব মতো লিউ-এব যাওয়ায় আপত্তি জানায়।

"তুমি গেলে আমি কাজ কববো কেমন কাব ?"

"কোনো ভাবনা নাই, তুমি বেশ পাকা চাষী, ববং দেখবে, এখনকাব চেয়ে বেশী খাটবে।"

"না, আমি তা পাবাবো না "

"পাববে না কেন, শুনি ? ক্ষেতেব কাজ তুমি আমার চেয়ে ভাল কবো। আমি ত এব আগে শুধু লডাই কবেছি, আব তুমি "

"আগে আব এখন। এখন তো আমরা দশেব জন্যে খাটি।"

মা-ব কথা শুনে সবাই হেসে ওঠে।

"কম্‌বেড মা, কাজ ক'রে যাও। আমি জানি, তুমি আমাব চেয়ে ভাল কাজ কবতে পাবো",—লিউ তাব পিঠ থাবডায়, মা পোষা পাখীব মতো শান্ত হয়ে যায়, বলে, "বেশ, আমি চেষ্টা ক'রে দেখবো। "

লিউ চলে যায়। মা প্রত্যহ প্রত্যুষে ওঠে, কাজ করতে কবতে আপন মনে বকে : "দেখিয়ে দেবো, আমি কি কবতে পাবি।"

নূতন জমিতে সে পাথর খোঁজে,—যেন সোনা খুঁজছে। তারপব সেগুলো নিয়ে গিয়ে পাথরের স্তূপটার উপর ফেলে। মুরগীগুলোর জন্যে গুহার পাশে একটা ছোট্ট কুঠরী তৈয়ার কবে, প্রচুর হাওয়া চলাচলেব জন্যে কয়েকটা

জানলা ফোটায়। ৎসাও মা-কে সাহায্য করে, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে, "চমৎকার ব্যবস্থা।"

নূতন বাসায় এসে মুরগীগুলো কলরব করে, ডিম পাড়ে, পাখা ঝাপটায়, উড়ে পাহাড়ের নীচের দিকে একটু নেমে আসে, বাচ্চা হ'লে সেগুলোকে 'মানুষ' করে।

মহিষটার জন্যে মা একটা গুহা খোঁড়ে, তার খাদ্য রাখবার গামলা প্রস্তুত হয়। মহিষ তার লালচে মুখের মধ্যে ঘাস পাতা টেনে নেয়, মা বসে বসে দেখে।

"গামলা তৈরী করার কথাটা মনে করেছিলে ভাল।"—ওয়াং-ফা প্রশংসমান চক্ষে চেয়ে থাকে।

মা গম্ভীরভাবে মহিষটাকে জিজ্ঞাসা করে, "কম্‌রেড মহিষ, গামলা পছন্দ হয়েছে ত?" মহিষ উত্তরে তার ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটো বন্ধ করে।

মা ভুট্টা ক্ষেতের আগাছা সাফ করে, শাকসব্জী লাগায়, সারি সারি বীজ বোনে, সুফলা মাটীতে একটুক্‌রোও পাথর পড়ে থাকতে দেয় না।

"ক'দিন থেকে দেখছি, কাজে তোমার উৎসাহের অন্ত নাই। ব্যাপার কি?"—ওয়াং-ফা ও ৎসাও দুজনেরই বিস্ময়ের অবধি নাই।

মা কোনো জবাব দেয় না, একটুখানি মুখ মুচকে হাসে।

দিন যায়। একটু একটু ক'রে গরম পড়ে। সোনালি রৌদ্রে জমি তপ্ত হয়ে ওঠে। পাহাড়ের বুকে পালে পালে গরু ভেড়া দেখা দেয়। ঘাসের উপর তাদের ছায়া চরে বেড়ায়। মেষপালকরা গাছের তলায় শিস্‌ দেয়। মেয়েরা কলরব ক'রে নদীতে আছড়ে আছড়ে কাপড় কাচে।

ভুট্টা দীঘল্‌ হয়ে ওঠে। মা সারাদিন নিড়ান দেয়। সকালে গাছের পাতা হতে শিশির ঝরে। তাজা মাটীর গন্ধে হাওয়া ভারাক্রান্ত, মা বুকভরে শ্বাস নেয়, যেন কতকাল পরে আবার মাঠে এসেছে।

(৫)

কূপ খনন শেষ হয়েছে।

নতুন কূপের পাশে মজুরেরা এসে জুটেছে, নাচ্ছে-কুদ্ছে, গান গাইছে। মা-র প্রবল উৎসাহ জাগে, সেও এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়:

"পতিত জমি চাষ করো রে ভাই।
দেশের জন্যে লড়্ছে যারা,
রসদ্ তাদের চাই ..."

মা স্থর ধরতে পারে না, তবু গায়। গেয়েই তার সুখ।

মা শাক্সব্জীতে জল দেয়। এগুলো বেশ বড় হয়েছে এখন, সবুজ পাতা মেলেছে। শালগমের পাতাগুলো ঝোঁপ দিয়ে উঠেছে। আলুর গোড়া কঞ্চির মতো খাড়া হয়েছে। সূর্যমুখী ফুলগুলো চাষী মেয়েদের মতো হাস্যময়ী।

লিউ এসে তাকে কি বল্বে, মা আপন মনে আওড়ায়: "এই তো! কমরেড্ মা চমৎকার কাজ করছে!" পুরাণো বন্ধুর মতো লিউ তার পিঠ থাব্ড়াবে।

মা ঘুমায়। লিউ ফিরে এসেছে। বন্ধুরা মা-র কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। লিউ-এর বড় আনন্দ। সবাইকে সে মাংস খাওয়ায়, মদ খাওয়ায়। তারপর, অন্য জায়গায় চাষবাসের কথা, লড়াই-এর কথা ওঠে। কেন সে বইপত্তর ছেড়ে বন্দুক ঘাড়ে নেয়, সৈন্যদলে ঢোকে,—লিউ তার ইতিহাস বলতে থাকে।

"ও, তুমি পড়াশুনা করতে বুঝি?"

"করতাম, কিন্তু ইস্কুল শেষ করেই ইস্তফা দিই।"

মা ভাবে: এ বড় আজব কথা! কেন লেখাপড়া ছেড়ে এই সামান্য সৈনিকজীবন যেচে নেওয়া? মরুক গে, লিউটা বড্ড বোকা। "ও সব থাক্, এখন আমাদের কাজের কথা হোক্। নিজেদের খেতে হবে, খেত-খামার

থেকে জাপভূতগুলোকে মেরে ভাগাতেই হবে।" সে জোর গলায় হাঁক্ ছাড়ে, "জোট বেঁধে আমাদের কাজ করতে হবে।"

*　　　　*　　　　*

মা-র ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্ন দেখছিল। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে।

চাল থেকে জল পড়ার শব্দ হয়, নদী গর্জন করে। মা কান পেতে শোনে।

পরের দিনটা মেঘ কাটে। সূর্য দেখা যায় না। পর্বতের বুকে স্তরে স্তরে মেঘ জমে আছে।

"যাঃ শালা"—মুরগী-ঘরটা ভেসে গিয়েছে দেখে, মা উৎকণ্ঠায় চীৎকার ক'রে ওঠে,—"এগুলো গেল কোথায়? মোরগছানাগুলো?"

চীৎকার শুনে ওয়াং-ফা, ৎসাও ছুটে আসে। তারাও চারিদিক খোঁজে। একটাও চোখে পড়ে না।

"এখন উপায়?" —মা-র বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে থাকে। মুরগীগুলোর কথা ভেবে তার মন অশান্ত হয়ে ওঠে, সে পুকুরটা পর্যন্ত নেমে আসে। হাঁসগুলো খেলা করছে, কিন্তু মুরগী একটাকেও দেখা যায় না।

"—ডুব শালা।" মা পুকুরে একটা ঢিল ছোড়ে। হাঁসগুলো ভয় পেয়ে, পাখা ঝাপ্‌টিয়ে, ঘাসের মধ্যে গিয়ে লুকোয়।

ওয়াং-ফা শুধায়, "তোমার হ'ল কি? মাথা বিগ্‌ড়ালো নাকি?" মা উত্তর দেয় না।

একখান ছড়ি হাতে মা কর্দমাক্ত পথ ধরে, ৎসাও তার পিছু নেয়। বৃষ্টির দাপটে ভুট্টা গাছগুলো নেতিয়ে পড়েছে, খাল-গর্তগুলো জলে টইটুম্বুর।

"শালার বৃষ্টি দেখো!"—মা গালি-গালাজ করে।

"অত খেয়াল করে না। এ ত সাধারণ ঘটনা।"—ৎসাও মা-কে বোঝায়। মা সকালে রৌদ্র ফুটে ওঠবার অপেক্ষা করে।

সূর্য দেখা দেয়। আকাশ এখনও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়নি। মা, ক্রমেই মনমরা হয়ে পড়ে, তার ওজন কমে যায়। ভাঁড়ের মতো সে আর নাচে না। চোখ নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

"আমি একটা আস্ত গাধা।" —মা নিজেকে ধিক্কার দেয়, গুহার মধ্যে বসে থাকে।

ৎসাও চোখ দিয়ে তাকে ভৎর্সনা করে, জিজ্ঞাসা করে, "তোমার বিরক্তিটা মাথামুণ্ড কিসের জন্যে?" মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ওয়াং-ফা তামাকের নল মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে মন্তব্য করে: "গালিগালাজ নিরর্থক। সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত থাকা ভাল।"

এক সপ্তাহ কেটে যায়, আকাশ পরিষ্কার হয়। মাঠে মাঠে আবার ডাকাডাকি হৈ-হল্লা সুরু হয়। গরু মহিষগুলো হাম্বা হাম্বা রব ছাড়ে। চাষীরা শপ্ শপ ক'রে চাবুকের শব্দ করে। নদীর ধারে ছেলেদের গান শোনা যায়:—

"দেশসীমান্ত রক্ষা করি, চল্।
দেখে নেবো জাপ-ভূতদের বল।"

মা আবার চাংগা হয়ে ওঠে। বোঝে না, কেন? সারাদিন সে গোরস্থানের কাছে নতুন জমিটায় কাজ করে। এখানে সে শণ আর যবের আবাদ করবে। ৎসাও কাছেই জমি নিড়ায়।

রৌদ্রে মাটী খরখরে হয়। চারিদিক বেশ উজ্জ্বল, উষ্ণ। ভুট্টা গাছগুলো আবার সজীব হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মাঠ হ'তে সমস্ত জল সরে যায়। সন্ধ্যাবেলা মা একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে একটা ঘাস-ছাওয়া ঢিপিতে বসে, ৎসাও হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, "ঐ যে ঐ! মুরগীগুলো! আমাদের সেই মুরগীগুলো!"

মা তবাক্ ক'রে লাফিয়ে ওঠে, তাইতো! ঘাসের মধ্যে থেকে কক্ কক্

করতে করতে মুরগীগুলো বেরিয়ে আসছে। মা সেদিকে ছুটে যায়। হাঁ, সবগুলোই আছে।

ভাল ভাল সোনা পেলেও বোধ হয় মা-র এমন আনন্দ হ'ত না। দৌড়ে গুহার ভিতর থেকে সে এক মুঠো ভুট্টা এনে মুরগীগুলোকে খাওয়াতে বসে। সে কি যত্ন, যেন নিজের শিশুকে খাওয়াচ্ছে।

পরদিন মা কাঠের তক্তা দিয়ে ও-গুলোর জন্যে একটা বাসা তৈরী করে। ছাদ হয়, দরজা হয়। দরকার মতো এটা সরানো চল্‌বে। "দেখে নেবো শালার বৃষ্টি কেমন ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"

শণ বড় হয়, তার ডাঁটাগুলো, লাল পাতাগুলো বেড়ে ওঠে। ভুট্টা পাকে। কূপের ধারে সূর্যমুখী ফুলের সভা বসে।

লিউ-তা-সুং একদিন ফিরে আসে। জ্যোৎস্না রাত্রি, গুহার দরজায় রূপালি আলো। সকলেই ঘুমিয়ে আছে। পায়ের শব্দ শুনে মা চোখ খোলে, "কে?"

"আমি।" লিউ-এর কণ্ঠস্বর মা-র পরিচিত। সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে চায়। লিউ মানা করে।

"উঠতে হবে না, আমিও এখন একটু ঘুমাবো।"

"খাওয়া হয়েছে তোমার?"

"খেয়েছি।" —লিউ কাঙ-এ উঠে মা-র পাশে শুয়ে পড়ে।

"জমিতে ভাল কাজ করেছ, না?"

"এমন আর কি? তবে বিশেষ মন্দ নয়।" মা কথা খুঁজে পায় না।

"অষ্টম রুট আর্মির হাতে পড়েছে জাপানীদের অনেক খাবারের টিন। ওরা আর কত খাবে? কিছু এদিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। সীমান্ত সরকার আমাদিকে সেগুলো সকলের মধ্যে বিলি করতে আদেশ দিয়েছে।" ঘুমে লিউ-এর গলা জড়িয়ে আসে।

মা-র আর ঘুম আসে না। শয্যার উপর চাঁদের স্নিগ্ধ আলো এসে পড়েছে। বাইবে আকাশ ঝলমল করছে। মা-র দিকে চেয়ে তারাগুলো মিট্‌মিট্‌ করে হাসছে। ঝিঁ-ঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে। নদীর কুলুকুলু আওয়াজ ভেসে আসছে।

“জাপানীদের টিনের খাবারও তা'হলে খেতে পাবো।”—মা ভাবে, কাল তার জীবনেব সব চেয়ে সুখেব দিন। *

---

* চীনা গল্প : য়েহ্-ছুং রচিত

—র‍্যাচেলের ভৎর্সনা—

জেরুজালেমের লোকগুলো বড্ড চপল, বড বেয়াড়া। আবাব তাবা ভগবানের সঙ্গে তাদেব মহাচুক্তিব কথা বিস্মৃত হয়ে পিতলেব প্রতিমাব কাছে বলি দিল। এই অধর্ম কবেই তাবা ক্ষান্ত হ'ল না, ভগবানেব ভক্তসেবক সলোমনেব মন্দিবেও তাবা 'ব্যালে'র মূর্তি প্রতিষ্ঠা ক'বে বলিব বক্তে মন্দিবের নর্দমাগুলো লালে লাল ক'বে তুললো।

তাঁরই পবিত্র পীঠে তাঁকে নিয়ে এমনি ধাবা বিদ্রূপ ভগবান যখন দেখলেন, তখন তাঁব বাগ ফেটে পডলো। তিনি হস্ত প্রসাবণ করলেন, তাঁর গর্জনে আকাশ কেঁপে উঠলো, এবার তাঁব ধৈর্য টুটেছে, পাপে-ভবা সহবটাকে এবাব তিনি ধ্বংস ক'বে দেবেন, এ-সহবেব লোকগুলোকে তুঁষের মতো উডিয়ে দেবেন। পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপব প্রান্ত পর্যন্ত তাঁব সঙ্কল্প ঘোষণা ক'বে বজ্র প্রতিধ্বনিত হ'ল।

মহাশক্তিমান্ তাঁব ক্রোধ প্রকাশ কবলেন, পৃথিবী আতঙ্কে কাঁপতে লাগলো। পিতামহ নোআর আমলেব মতো, আকাশের বাতায়নগুলো খুলে গেল, গভীর সমুদ্রের তলে ঝর্ণাগুলো ফেটে পডলো, উচু পাহাড়গুলো হুডমুড ক'রে পডতে লাগলো, আকাশের পাখী মাটীতে পডলো, ভগবানের ক্রোধের তীব্রতায় দেবদূতরা পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে গেলেন।

নীচে, অনেক নীচে, অভিশপ্ত জেরুজালেমের পুরবাসীরা ভগবানের কণ্ঠ-নিঃসৃত বজ্রধ্বনি শুনলো, কিন্তু তার মর্ম গ্রহণ করতে পারলো না। তারা বুঝলো না, তাদের মৃত্যুর পরোয়ানা বেরিয়ে গিয়েছে। এটুকু কিন্তু তারা বেশ বুঝতে পারলো, পৃথিবীর ভিৎ পর্যন্ত টলে উঠেছে, ভরা দুপুরে মাঝরাত্রির অন্ধকার নামলো, প্রবল বাত্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনস্পতির গুঁড়িগুলো পর্যন্ত পাটকাঠির মতো মট্‌মট্‌ ক'রে ভাঙতে লাগলো। মাথার উপর ছাদ ভেঙে পড়ার ভয়ে তারা বাড়ীঘর ছেড়ে খোলা জায়গায় আশ্রয় নিল, ঝড়ের দাপটে, বৃষ্টির ঝাপটায়, ঘনান্ধকার মহাশূন্যে গন্ধকের তীব্র গন্ধে, তাদের আতঙ্ক আরও বেড়ে গেল। পরণের কাপড়চোপড় ছিঁড়ে, মাথায় ছাই মেখে, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে মিছেই তারা ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলো। পঞ্চভূতের মত্ততা তাতে একটুও শান্ত হ'ল না, অন্ধকার একটুও পরিষ্কার হ'ল না।

ভগবানের ক্রুদ্ধ গর্জন এমনি ভীষণ হ'ল যে, অন্তিম তূর্যনাদের প্রতীক্ষায় যে সব প্রেতাত্মারা যথাবিহিত নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন তাঁরাও মৃত্যুলোকে জেগে উঠলেন, ভাবলেন, সেই ভীম আহ্বানই বা এল। তাঁরা গাত্রোত্থান ক'রে স্বর্গের দিকে ডানা মেললেন, মহাঝঞ্ঝা ভেদ ক'রে গিয়ে শুনলেন, শেষ বিচারের দিন এখনও আসে নি। না আসুক, এই সব পিতাপিতামহদের আত্মারা ভগবানের সিংহাসন ঘিরে সমবেত হলেন, প্রার্থনা জানালেন, তাঁদের সন্তানদের উপর হ'তে, পবিত্র সহরের চূড়াগুলো হতে, ভগবান তাঁর রুদ্র অভিশাপ সম্বরণ করুন। এই প্রার্থনায় অগ্রণী হলেন আব্রাহাম, আইজাক্ আর জ্যাকব্। ভগবানের রুদ্রনাদে তাঁদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল, ভগবান ঘুরে ফিরে একই কথা আওড়াচ্ছিলেন, তাঁর সৃষ্ট জীবদের একগুঁয়েমি তিনি যথেষ্ট সয়েছেন, আর না। যতই অকৃতজ্ঞ হোক্ ওরা, মন্দির চূর্ণ হয়ে গেলে, প্রেম দিয়ে ওদিকে যা শেখানো যায় নি, এবার তা শেখানো যাবে।

ভগবানের 'খাস্ পেয়ারের জাতের' পূর্বপুরুষদের মুখ এমনিভাবে বন্ধ হয়ে গেল, এবার পয়গম্বর স্যামুয়েল এলিজা আর এলিসা অগ্রসর হয়ে তাঁদের মিনতি জানালেন। জীবিতকালে এঁরা ছিলেন ভগবৎবাণীর উৎস। এঁরা ছিলেন সেই জাতের মানুষ, যাঁদের জিহ্বায় বহ্নিউদ্‌গীরিত হয়, যাঁদের অন্তরে জলতো অগ্নিকুণ্ড। ভগবান কিন্তু তাঁদের কথায়ও কান দিলেন না। তাঁর কোপবাত্যার তাড়নায় পয়গম্বরদের কথাগুলো তাঁদের মুখের উপর ছিটকে ফিরে এল। মন্দিরকে ভস্মীভূত ক'রে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার জন্যে বিদ্যুৎ আরো চক্‌মক্ ক'রে উঠলো।

পয়গম্বর আর ঋষিরা দমে গেলেন। তাঁদের আত্মা বাত্যাহত তৃণের মতো কাঁপতে লাগলো, পায়ে-মাড়ানো মৃতপত্রের মতো শুষ্ক হয়ে গেল। তাঁদের কারও মুখে আর একটীও কথা ফুটলো না। শুধু র‍্যাচেলের—একজন নারীর আত্মা কোনও বাধা মানলো না। ইস্রাইলের মহা-মাতা এই র‍্যাচেল, 'রামাহ্'র কবরে সে শুয়েছিল, ভগবানের ঘোষণা শুনে অবধি তার সে-কি কান্না! কিছুতেই তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। ভালোবাসার জোরে সে ভগবানের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে অগ্রসর হ'ল। ভগবানের মুখ সে দেখতে পাচ্ছিল না—দেবদূত ছাড়া, শেষবিচারের দিনের আগে তো কেউ সে মুখের দিকে চাইতে পারে না। নতজানু হয়ে, ঊর্ধ্বে হাত তুলে, র‍্যাচেল তার যা বলবার বললো :—

"হে সর্বশক্তিমান্, এভাবে তোমাকে সম্বোধন করতে গিয়ে আমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তুমিই তো আমার হৃদয়কে এমনি ভীতু ক'রে গড়েছো। তুমি আমাকে যে মুখ দিয়েছো, তাই দিয়ে ভয়ে ভয়ে তোমাকে আমার মিনতি জানাচ্ছি। আমার সন্তানদের পরম প্রয়োজনই আমার শক্তি যোগাচ্ছে। তুমি আমাকে জ্ঞান দাওনি, চাতুর্য দাওনি, কেমন ক'রে তোমার রাগ শান্ত করি, তাও আমি জানি না। তুমি জানো, আমি

কি বলতে এসেছি, মানুষের মুখ হ'তে শোনবার আগেই-যে সব কথা তোমার মানসগোচর হয়ে যায়, মানুষের সকল কাজই-যে তুমি আগে হতে দেখতে পাও। তবু, তোমাকে মিনতি করি, ওই পাপীদের পক্ষ নিয়ে আমি যে কথা বলছি, তা শোনো।"

এই বলে, র‍্যাচেল্ মাথা নত করলো। ভগবান তার নম্রতা দেখলেন, লক্ষ্য করলেন তার গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে। তিনি ক্রোধ সম্বরণ করলেন, র‍্যাচেলের ওকালতি শোন্‌বার জন্যে শান্ত হয়ে চোপচুপে বসলেন।

স্বর্গে ভগবান যখন কান পেতে কিছু শোনেন, মহাব্যোম্ বিক্ত হয়ে যায়, কালের গতি রুদ্ধ হয়। তাই, হাওয়ার গোঙানি বন্ধ হ'ল, বজ্রের গর্জন ক্ষান্ত হ'ল, লতিয়ে বা হামা-দিয়ে যারা চলে, তাদের চলা থেমে গেল, আকাশের পাখীরা ডানা গোটালো, কারও নিশ্বাস ফেলবার পর্যন্ত সাহস হ'ল না। 'হোবা'গণ স্তম্ভিত হ'ল, বিশিষ্ট দেবদূতরা পর্যন্ত প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে গেলেন। বেশী কি, সূর্য, চন্দ্র তারাদেরও চক্রাবর্তন স্থগিত রইলো, নদীর প্রবাহ থেমে গেল।

নীচে—বহু নীচে, অভিশপ্ত জেরুজালেমপুরীর অধিবাসীরা জানলো না, র‍্যাচেল তাদের হয়ে ভগবানের দরবারে ওকালতি করছে, তারা জান্‌লো না, ভগবান তার কথা শুনছেন। স্বর্গে কি হয় না-হয়, মরজীবরা তো তার ধারণা করতে পারে না। তারা শুধু বুঝলো, ঝড় শান্ত হয়ে গিয়েছে। ভরসা ক'রে আকাশের পানে চাইতেই তারা দেখলো, সমস্ত আকাশ ব্যেপে কালো মেঘ তখনও ঝুলছে। নিরন্ধ্র অন্ধকারে, বিশেষ করে, আকাশের থম্‌থমে ভাবটা তাদিকে মড়া-জড়ানো ক'রে ক্রমেই মুড়ে ফেলছিল ব'লে তাদের ভয় বেড়ে গেল।

ভগবান তার প্রার্থনা মন দিয়ে শুনছেন দেখে র‍্যাচেলের বুকে বল এল, ঊর্ধ্বদিকে বাহু তুলে সে ব'লে চললো :—

"প্রভু, আপনি জানেন, আমি পূবের লোকদের দেশ—হারানে বাস করতাম। সেখানে আমার বাবা লাবানের মেষ চরাতাম আমি। একদিন সকালে আমরা, কুমারী মেয়েরা, মেষগুলোকে জল খাওয়াতে নিয়ে গেছি, গিয়ে কিন্তু, কুঁয়োর মুখ থেকে পাথরটা গড়িয়ে দেবার মত জোর পেলাম না। তখন এক জোয়ান, পরদেশী লোক সে, খাসা গড়ন,—সে লাফিয়ে এগিয়ে এল আমাদের সাহায্য করতে আর এতো সহজে পাথরটিকে সরিয়ে দিল,—তা' দেখে আমরা অবাক হ'য়ে গেলাম। তার নাম জ্যাকব, আমার পিসীর ছেলে ছিল সে। সে তার পরিচয় দিলে পর, আমি তাকে আমার বাবা লাবানের বাড়ী নিয়ে গেলাম। কুঁয়োর ধারে দেখা হবার একঘণ্টা যেতে না যেতে, পরস্পরের জন্যে আমাদের মন-কেমন করতে লাগলো। তাকে ভেবে ভেবে রাতে আমার ঘুম হ'ত না,—বলতে আমার লজ্জা কি?—পিরীতের আগুন আমাদের বুকে জ্বল্‌লে সেটা চিতার মতো দাউ দাউ করেই জ্বলে। সে তো তোমার ইচ্ছায়, নইলে, এমন হয় কেন? তোমার ইচ্ছায়ই তো মেয়ে পুরুষের আলিঙ্গনের জন্যে 'আঁকুপাকু' করে, জোয়ান ছেলে আর কুমারী মেয়ের মধ্যে মনের টান ধরে। যেন যাদু। এই সবের জন্যে, আমরা মনের আগুন নিবোবার চেষ্টা না ক'রে, প্রথম দেখার দিনই জ্যাকব্ আর আমি বাগ্‌দত্ত হ'লাম। প্রভু, তুমি জানো, আমার বাবা লাবানের মেজাজ ছিল কড়া, যে পাথুরে জমি তিনি চাষ করতেন তার মতো,—তাঁর জোতের বলদের শিং যেমন ছিল, তেমনি কড়া। যখন জ্যাকব তাঁর কাছে আমাকে বিয়ে করার কথা পাড়লো, তাঁর মনে হ'ল, দেখতে হবে, তাঁর ভাবী জামাই, তাঁর ভাগ্নেটা, তাঁর নিজের দরের লোক কি না, কড়া খাটিয়ে কিনা, তার লোহার মতো ধৈর্য আছে কিনা। লাবান্—আমার বাবা—জানিয়েছিলেন, আমাকে বিয়ে করতে হ'লে সাত বছর খেটে শুল্ক দিতে হবে। আমার আঁত্ কেঁপে উঠলো, জ্যাকবের গাল দুটো ফ্যাকাশে হ'য়ে

গেল, কেন না, আমরা দুজনেই তখন অল্পবয়সী, অধীর। সাত বচ্ছর যেন অনন্ত কাল বলে মনে হ'ল। তোমার কাছে, প্রভু, সাত বছর তো এক মুহূর্তের সামিল, চোখের পলক ফেলার মতো, অনাদি অনন্তের কাছে সময় তো কিছুই নয়। এটা তুমি ভুলো না, প্রভু, আমাদের কাছে, মর মানুষের কাছে কিন্তু, সাত বছর হচ্ছে জীবনের এক দশমাংশ। আমাদের আয়ু অল্প, চোখ খুলে তোমার পবিত্র আলো দেখতে না দেখতে আমাদের চোখ আবার মৃত্যুর অন্ধকাবে বন্ধ হয়ে যায়। বসন্তেব বানের মতো মানুষের জীবনস্রোত ছুটে চলে, যে ঢেউ যায়, তা আর ফেবে না। সাতটা দীর্ঘ বছর সাথী হয়েও এমন ক'বে দূবে থাকতে হবে! আমাদেব ঠোঁট যখন চুমু খাবার জন্যে মরে যাচ্ছে তখনো এমন আলাদা হয়ে থাক্‌তে হবে! তবু জ্যাকব তার মামাব ইচ্ছাই পালন কবলো, আমি আমার বাবাব আদেশ মেনে নিলাম। আমবা মনে মনে ঠিক করলাম সাত বছরই প্রতীক্ষা কব্‌বো, বাবার বাধ্য হয়ে চলবো, ধীর হয়ে থাকবো,—আমরা যে সত্যিসত্যিই ভালোবাসতাম। তুমি কিন্তু, প্রভু, তোমার জীবদের পক্ষে ধৈর্য ধরা কঠিন করে রেখেছ, পীবিতেব জ্বালা দিয়েছে, জীবন একটু ব'লে উদ্বেগ লেগেই থাকে। ঋতুব পবে ঋতু আসে জানি, বসন্ত তবু কদিনের জন্যে? তাই তো আমরা জীবনে যা আনন্দ পাওয়া যায় লুফে নিই, তাইতো আমরা দু'দিনের আমোদ লুটে নিতে চাই। দিন দিন আমাদের বযস বাড়ে, মনমরা না হয়ে অপেক্ষা আমরা করবো কি ক'রে বলো? সত্যিই তো, আমরা পুড়ি, তোমার হুকুমে, আমাদেব কেবলই ক্ষয় হয়। মৃত্যু দিনরাত কুকুবের মতো আমাদের পিছনে পিছনে ধাওয়া করছে ব'লে, তাডাতাডি না-করে আমাদের উপায় কি? প্রতি দিনের প্রতীক্ষা আমাদের কাছে হাজাব বছর মনে হ'ত, তবু আমবা প্রবৃত্তির রাশ ধরে দিন কাটালাম। শেষে, সাত বছর পূর্ণ হ'লে অতীতের কথা ভাবতে গিয়ে মনে হ'ল যেন, এক দিনের বেশী নয় তা।

এমনি ক'রে, প্রভু, আমি জ্যাকবেব জন্যে প্রতীক্ষা কবেছিলাম। জ্যাকবও আমাকে এমনি ভালোবাস্‌তো, প্রভু।

"সাত বছর যখন পূর্ণ হয়ে গেল, আমি মনের আনন্দে বাবা লাবানেব কাছে গিয়ে আমাদের বিয়ের তাঁবু তৈবী করতে বললাম। আমার বাবা লাবান কিন্তু আমার আনন্দ দেখেও উদাসীন রইলেন। তাঁর কপালে মেঘ নামলো, কিছুক্ষণের জন্যে তাঁব মুখে কথা সবলো না। শেষে, কথা ফুটলে, আমায় হুকুম দিলেন, আমাব দিদি লিয়াকে ডেকে দিতে।

"তুমি জানো প্রভু, লিয়া ছিল আমাব চেয়ে দু'বছরেব বড, শ্রীহীন ব'লে কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইত না, আব সেজন্য তাব মনে খুব দুঃখ ছিল। আমি কিন্তু তাকে খুব ভালোবাসতাম, তাব কষ্টের জন্যে, তার শান্ত স্বভাবের জন্যে। বাবা যখন আমায় লিয়াকে ডাকতে বললেন চট্‌ ক'রে আমার খেয়াল হ'ল, বাবা আমাকে আব জ্যাকবকে ঠকাবার মৎলব এঁটেছেন। আমি তাই তাঁবুর কাছে লুকিয়ে থাকলাম, ওদের কি কথাবার্তা হয় শুনবাব জন্যে। আমার বাবা বললেন :—

'লিয়া, আমাব ভাগ্নে জ্যাকব সাত বছব অনুগতভাবে খেটেছে, র‍্যাচেলকে স্ত্রী বলে পাবাব আশায়। তোমার জন্যে কিন্তু, আমি তা হতে দেব না। বড় মেয়ে থাক্‌তে ছোটব বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ তো আমাদের দেশে নাই। আদিতে সর্বশক্তিমান্‌ আদেশ দিয়েছিলেন, ফলবন্ত হ'তে, সংখ্যায় বাড়তে, যাতে তাঁর জগৎ আমবা মানুষ দিয়ে ভরে দিতে পাবি—যাতে তাঁর স্তুতি কববার জন্যে আমরা অনেকেব জন্ম দিতে পাবি। তিনি চাননি, কোনো জমি অনাবাদী পডে থাকে কি কোনো মেয়ে-ছেলে মা না হয়,—এমন কোনো ভেড়ী অথবা এমন কোনো গাই তুমি আমার গোষ্ঠে পাবে না, যার সন্তান হয় না। আমার বড মেয়ের গর্ভ বন্ধই থেকে যাবে, এমনটা আমি কেমন ক'রে হ'তে দিতে পারি? লিয়া, তুমি তৈরী হও, কনে-

-বউএর ঘোমটা পড়ো গে, জ্যাকব না জেনেই র‍্যাচেলের বদলে তোমাকে বিয়ে করবে।' আমার বাবা লিয়াকে এই কথাগুলো বললেন। লিয়া ভয়ে ভয়ে চুপ ক'রে শুনলো।

"আড়ি পেতে এ-সব শুন্‌তে শুন্‌তে, বাবা লাবান আর দিদি লিয়ার ওপর আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। সন্তানের কি বোনের এমন হওয়া ঠিক নয়, প্রভু, তার জন্যে তুমি আমায় ক্ষমা করো। কিন্তু একবার ভেবে দেখো জ্যাকব আর আমি কেমন ক'রে সাত বচ্ছর ধরে একজন আর-জনের প্রতীক্ষা করেছি, আর এখন, এই সাত বছর খাটুনীর পর, জ্যাকবকে ঠকিয়ে তার ঘাড়ে আমার দিদিকে চাপিয়ে দেওয়া হবে। জ্যাকবের জীবন যে নিজের জীবনের চেয়েও আমার প্রিয়, আমি বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলাম,—জেরুজালেমে তোমার সন্তানরা যেমন বিদ্রোহ করেছে তোমার বিরুদ্ধে, তেমনি,—তুমি যে, প্রভু, আমাদিকে এমনিই ক'রে তৈরী করেছ যে, আমাদের উপর কোনও অবিচার করা হয়েছে মনে হলেই আমরা একগুঁয়ে হয়ে পড়ি। আমি লুকিয়ে গিয়ে জ্যাকবকে বাবার চক্রান্তের কথা বললাম। বাবার মতলব ব্যর্থ করার জন্যে, কি চিহ্ন দিয়ে সে আমাকে চিনতে পারবে, তা বলে দিলাম, বললাম, 'বিয়ের পর, তাঁবুতে ঢুকবার আগে কাল তোমার কপালে তিনবার চুমু দেব।' জ্যাকব বুঝে নিল। ইসারাটা তার মনেও ধরলো।

"বিকেল বেলা বাবা লাবান্ লিয়াকে কনে-বউএর ঘোমটা পরালেন। তার মুখখানিকে নিপুণভাবে সাজিয়ে দিলেন, যাতে জ্যাকব তার সঙ্গে সঙ্গম করার আগে তাকে চিনে না ফেলে। আমাকে তিনি গোলাঘরে বন্ধ ক'রে রাখলেন। তাঁর ভয় ছিল, পাছে চাকরদের কেউ ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমায় সাবধান ক'রে যায়। অন্ধকারে আমি প্যাঁচার মতো বসে থাকলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গিয়ে সন্ধ্যা পড়লো। রাগে দুঃখে আমি মাথা খুঁড়তে লাগলাম।

জ্যাকব তার সঙ্গে শোবে ব'লে কিন্তু আমি আমার দিদির উপর রাগ করিনি, প্রভু, আমি চটেছিলাম, সে যার জন্যে সাত বচ্ছর ধরে ক্রীতদাসের মতো খাট্‌ল, তা হ'তে আমার প্রিয়তমাকে বঞ্চিত করার জন্যে। করতাল বেজে উঠলে আমি আমার হাত কামড়ে ধরলাম। সিংহ যেমন তার শিকার নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করে, আমার হৃদয়বৃত্তিগুলো তেমনি ক'রে আমার বুকটাকে ছিঁড়ে খেতে লাগলো।

"এমনিভাবে বন্দী থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটতে লাগলো,—তিক্ততায় বুক ভরে উঠেছিল। তারপর আমার বুকের অন্ধকারের মতোই বাইরের অন্ধকার যখন দুর্ভেদ্য হ'ল, তখন হঠাৎ ঘরের আগল সরে গেল, আস্তে আস্তে দরজায় ফাঁক হ'ল, লিয়া এসে ঘরে ঢুকলো। বিয়েতে বসবার আগে লিয়া চুরি ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি তার পায়ের শব্দ চিন্‌লাম, কিন্তু তার দিকে ফিরে তাকালাম না। তার উপর আমার বৈরীভাব হয়েছিল, তার উপর আমার মন কঠিন হয়ে গিয়েছিল। লিয়া আমার চুলের মধ্যে হাত বুলোতে লাগলো, আমি মুখ তুলে তার দিকে যখন চাইলাম, দেখলাম, তার মুখে একটা বিষাদের ছায়া। প্রভু, আমি খোলামনেই তোমার কাছে স্বীকার করছি,—ওর অসোয়াস্তি দেখে আমার মন বিদ্বেষবশে যেন খুসী হ'য়ে উঠলো। লিয়াও যে বিয়ের দিনে কষ্ট পাচ্ছে, তা দেখে, আমার একটু সান্ত্বনা হ'ল। লিয়া কিন্তু—বড় গোবেচারী ভাল মানুষ সে—আমার মনের ভাব টের পেল না। আমরা কি একই মায়ের স্তন পান করিনি? চিরকাল একজন আর একজনকে ভালোবাসিনি? বিশ্বাস ক'রে সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে শুক্‌নো মুখে বলে গেল :—

'র‍্যাচেল, এসবের ফল কি হবে, ভাই। বাবার মৎলবে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। বাবা তোর ভালোবাসার লোককে তোর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আমাকে দিচ্ছেন, তাকে এমন ক'রে ঠকানোর কথা ভাবতেই

বড দুঃখ হয়। তোর জায়গায় আমি কোন্ সাহসে বিয়ে করতে যাবো? আমার পা যেন নডতে চাইছে না, আমার মন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, সে নিশ্চয়ই এই প্রবঞ্চনা ধরে ফেল্‌বে। তারপর সে যদি আমায় তাঁবু থেকে তাড়িয়ে দেয়, কি লজ্জাটাই পাবো! দুপুরুষ ধরে ছেলেরা আমাকে ঠাট্টা করবে, বলবে: ঐ লিয়া যাচ্ছে। কুচ্ছিৎ লিয়া! ওব কাহিনী জানো? একজনের ঘাডে ওকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার অজান্তিতে, স্বামী জানতে পেরে ওকে নেয়নি, লোমওঠা খেঁকী কুকুরকে যেমন তাডায়, তেমনি ক'রে 'ছেই ছেই' ক'বে তাড়িয়ে দিয়েছিল।—র‍্যাচেল, ভাই, আমি কি করবো? সাহস ক'রে এগুবো, না, বাবার আদেশ অমান্য করবো, বাবা কি বকম কডা লোক জানিস তো? জ্যাকব যাতে আমাকে খুব শীঘ্রি চিন্‌তে না পারে, তাব জন্যে আমি কি করবো—যাতে আমাব মাথা লজ্জায় না কাটা যায়, তাব জন্যে কি করবো ভাই? আমাব কি দোষ? করুণাময় ভগবানেব দোহাই, আমায় সাহায্য কর্ বোন, আমাকে সাহায্য কর্।'

"প্রভু, আমাব তখনও বাগ খুব প্রবল, দিদিকে যতোই ভালোবাসি না কেন, আমাব মনের পাপ তার উদ্বেগকে আমার কাছে মধুব ক'বে তুলেছিল। তবু, সে যখন তোমাব পবিত্র নামে, তোমার পবিত্রতম নাম উচ্চারণ ক'রে, তোমার 'করুণাময়' নাম নিয়ে আমায় কাকুতি মিনতি করল, তখন তোমার করুণার মহিমা, তোমার মঙ্গলময়তাব, তোমার নামের শক্তি আমার শিরায় শিরায় সুরার মতো সঞ্চারিত হ'য়ে গেল, আমার অন্ধকার আত্মায় উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রবেশ করলো। এযে তোমাব চিরন্তন ইন্দ্রজাল প্রভু, যে-মুহূর্তে আমরা প্রতিবেশীর বেদনায় সহানুভূতি বোধ করি, তার উৎপীড়িত বক্ষের যন্ত্রণার অংশ গ্রহণ করি, সেই মুহূর্তে যে-বাধার প্রাচীর একজনকে আর একজন হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে

তা চূর্ণ হয়ে যায়। তাই, নিজের দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে, আমি লিয়ার কাতরতায় কাবু হয়ে পড়লাম। আজ যেমন আমি সজলচোখে তোমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছি, তেমনি ক'রে সে যখন আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল, আমি, তোমার মূর্খ সেবিকা হয়ে—একথাটা তুমি বিশেষ ক'রে খেয়াল করো, দোহাই তোমার,—আমি তাকে করুণা করলাম। আজ আমি যেমন তোমার করুণা ভিক্ষা করছি, সে তেমনি ক'রে আমার অনুগ্রহ চেয়েছিল ব'লে আমি তাকে দয়া করলাম। জ্যাকবকে কেমন ক'রে ঠকানো যাবে, নিজেকে উপেক্ষা ক'রে তাকে বলে দিলাম, জ্যাকবকে যে চিহ্ন দেখে চিনে নিতে বলেছিলাম, তা আমি তার কাছে ফাঁস ক'রে দিলাম, বললাম, 'তাঁবুতে ঢুকবার আগে তার কপালে তিনবার চুমু খেও।' হে করুণাময়, তোমার প্রেমের খাতিরে, আমার অন্তরের বিদ্বেষকে আমি জয় করেছিলাম, যে মানুষকে আমি ভালোবাসতাম তারও বিশ্বাস ভেঙ্গে ছিলাম।

"গোপন কথাটা লিয়াকে যখন বললাম, সে আর থাক্‌তে পারল না, আমার হাত নিয়ে খেলা করতে করতে আমার বস্ত্রাঞ্চলে চুমু দিতে দিতে সাষ্টাঙ্গ হয়ে সে আমায় প্রণাম করলো। তোমার জীবদের তুমি এমনি করে গড়েছ যে, কারও মধ্যে তোমার মহত্ত্বের চিহ্নমাত্র পেলে তাদের চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। আমরা একজন আর-জনকে জড়িয়ে ধরলাম, চোখের জলে আমাদের গাল ভিজে গেল। সান্ত্বনা পেয়ে লিয়া যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। যখন উঠলো, আবার তার মুখ বিষাদে ছেয়ে গেল, আবার তার ঠোঁট দুটো শাদা হয়ে গেল।

"সে বললো, তোর ভালোবাসার জন্যে তোকে আর কি বলবো ভাই। তুই যা বললি, তাই করবো। কিন্তু ওর যদি ঐ ইঙ্গিতটুকুতেই বিশ্বাস না হয়? র‍্যাচেল, আমার আরও পরামর্শ চায় যে। তোর নাম ধরে আমায় ডাকলে, আমি কি করবো। বর কনের কাছে কথা বললে কনে হয়ে আমি

একদম মুখ বন্ধ ক'বে থাকবো ? আমি মুখ খুললেই সে-যে বুঝতে পারবে, সে শুয়ে আছে লিয়ার সঙ্গে, র‍্যাচেলের সঙ্গে নয়। আমি তো তোর গলায় ওর সঙ্গে কথা বলতে পারবো না। আমায় আরও একটু সাহায্য কর্, ভাই, তোব বুদ্ধি আছে, করুণাময়েব দোহাই, আমায় উদ্ধার কর্।

"প্রভু, আবার সে তোমার পবিত্রতম নাম উচ্চারণ ক'রে আমার কাছে আবেদন করল, আবার সেই মত্ততাময় অগ্নিপ্রবাহ আমার মধ্যে সঞ্চারিত হ'ল, আমার হৃদয় গলে গেল, নির্মম হয়ে নিজের কামনাকে পায়ে মাড়ালাম, আমি একেবাবে চরম উৎসর্গের জন্যে প্রস্তুত হলাম। আমি উত্তব, দিলাম ঃ—

'তার জন্যে ভেবো না। একটা উপায় করা যেতে পারে। সর্বকরুণাময়ের খাতিরে, তোমাকে র‍্যাচেল মনে ক'রে জ্যাকব যতক্ষণ তোমার সঙ্গে শোয়া শেষ না কবে ততক্ষণ সে যাতে তোমাকে চিনতে না পারে, তার ব্যবস্থা আমি কবছি। আমার মৎলব হচ্ছে এই ঃ আমি চুপি চুপি জ্যাকবের তাঁবুতে ঢুকে বরকনের খাটের পাশে অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে লুকিয়ে থাকবো। সে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে, আমি তার জবাব দেবো'খন, তাহলে তার আর কোনও সন্দেহ হবে না, ও তোমাকে আলিঙ্গন করবে, তোমার মধ্যে তার বীজ ঢেলে তোমাব দেহেব ফুল ফোটাবে। এ আমি করবো, ছেলেবেলা হতে আমরা পবস্পরকে যে ভালবাসা দিয়ে এসেছি তার খাতিরে, আর সর্বকরুণাময়েব প্রেমের খাতিরে। এই তাঁর পবিত্রতম নাম নিলাম, তিনি যেন আমাব সন্তানসন্ততির 'পরে অনুগ্রহ রাখেন।'

"প্রভু, তারপর, লিয়া আমায় জড়িয়ে ধরে মুখচুম্বন করলো। সে জানু পেতে বসেছিল, যখন উঠলো, তখন সে যেন অন্য মেয়ে হয়ে গিয়েছে। দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত হয়ে, ঘোমটায় মুখ আবৃত ক'রে সে জ্যাকবের কাছে

নিজের দেহ অঞ্জলি দিতে গেল। আর আমি? আমার প্রেমিক যে খাটের উপর দিদিকে ভোগ করবে সেই খাটের পাশে গিয়ে আমি লুকিয়ে থাকলাম,—আমি নিঃশেষে বিষপাত্র পান কবলাম। কিছুক্ষণ পরেই আবার করতাল বেজে উঠলো, সঙ্গীতকাররা নবদম্পতিকে এগিয়ে দিয়ে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই নবদম্পতি তাঁবুর দরজায় এসে দাঁড়ালো। বউকে আশীর্বাদ করবাব জন্যে তার ঘোমটা ওঠাবার আগে জ্যাকব প্রতিশ্রুত ইসাবার প্রতীক্ষায় একটু থামলো। লিয়া তিনবাব তাব কপালে চুমু খেল। ঠিকমতো চিহ্ন পেয়ে জ্যাকব নিঃসংশয় হ'ল, আবেগভবে কনেকে জড়িয়ে তাকে বাহুতে তুলে নিয়ে যে-খাটের পাশে আমি গুঁড়ি মেরে বসেছিলাম, তাব উপব এনে শোয়ালো। লিয়া আশঙ্কা কবেছিল ঠিকই,—পূর্ণ আলিঙ্গন কববাব আগে জ্যাকব জিজ্ঞেস করলো—"আমার বাহুবন্ধা তুমি সত্যিই র‍্যাচেল তো?" আমি ফিস্‌-ফিস্‌ ক'বে বললাম, (প্রভু, তুমি তো জানো, কথাগুলো উচ্চারণ কবতে আমাব বুক কি বকম ফেটে যাচ্ছিল) :—'হাঁ, আমি। জ্যাকব, স্বামী আমাব!' সাত বছর ধরে আমাকে পাবার জন্যে অপেক্ষা ক'রেছিল সে, সে আমাব গলা চিনতে পেবে আমার দিদি লিয়াকে তার মতো ভবা জোয়ান মানুষ যেমন ক'রে জড়িয়ে ধবতে পাবে তেমনি ক'রে জড়িয়ে ধরলো। প্রভু, কাস্তে যেমন করে ঘাস কাটে, তোমার দৃষ্টিও তেমনি অন্ধকার ভেদ ক'বে চলে, তুমি নিশ্চয় আমার অবস্থা দেখেছিলে। আমার সমস্ত অঙ্গ যখন জ্যাকবের আলিঙ্গনকামনায় উন্মত্ত, আর আমার সঙ্গভোগ কবছে মনে ক'রে জ্যাকব যখন লিয়াকে ভোগ করছিল তখন তাদের নাগালের মধ্যেই আমি গুঁড়ি মেরে পড়ে ছিলাম। প্রভু! তুমি তো সর্বত্র থাক, সে রাত্রের কথা একবার স্মরণ ক'রে দেখো, দীর্ঘ সাত ঘণ্টা ধরে কি যন্ত্রণাই না সহ্য করেছিলাম পড়ে পড়ে। যে চরম-আনন্দ আমার প্রাপ্য ছিল, তা হতে

বঞ্চিত হ'য়ে তারই মণিত শুনছিলাম। সাত ঘণ্টা, সাত যুগ, শ্বাসরোধ ক'রে আমি সেই খাটের পাশে শুয়েছিলাম। বুক ডুক্‌রে কেঁদে উঠতে চাইছিল, জ্যাকব যেমন উত্তরকালে তোমার দেবদূতের সঙ্গে ভোর না হওয়া পর্যন্ত ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিল, তেমনি ক'রে আমিও সেই বুকের কান্নার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিলাম। জ্যাকবের জন্যে সাত বচ্ছর প্রতীক্ষায় থেকে এই সাত ঘণ্টা যেন আরো দীর্ঘ, আরো অনেক দুঃসহ বোধ হচ্ছিল। মনে মনে তোমার পবিত্র নাম জপ করতে না থাকলে, তোমার অনন্ত ধৈর্য ধ্যান করতে করতে সংকল্প দৃঢ় না হয়ে উঠলে, সেই পরম তিতিক্ষার রাত্রে আমার পক্ষে এতখানা সওয়া কখনই সম্ভব হ'ত না।

প্রভু, জীবনের তীর্থযাত্রায় প্রথম দিকের শুধু এই কাজটার জন্যেই আমার গর্ব। সেইদিন তিতিক্ষায় করুণায় আমার স্রষ্টার সমকক্ষ হ'য়ে উঠেছিলাম আমি। সেই যন্ত্রণার রাত্রে, যে ভার তুমি আমার উপর চাপিয়েছিলে, কোনো মেয়ের উপর সে-ভার তুমি কখনও চাপিয়েছ কি না সন্দেহ। আমি সহ্য করেছিলাম চরম। তারপর, মোরগ ডাক্‌লে, নবদম্পতি যখন গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত, আমি শ্রান্তভাবে উঠে তাড়াতাড়ি বাড়ী পালিয়ে এসেছিলাম। শীঘ্রিই-যে প্রবঞ্চনা প্রকাশ হয়ে যাবে! জ্যাকবের ক্রোধের কথা ভেবে আমার দাঁত ঠক্ ঠক্ করছিল। হায়রে! আমার ভাবনাই সত্য হ'ল। বাবার বাড়ীতে নিরাপদে পৌঁছেছি, অমনি জ্যাকবের ক্রুদ্ধ চীৎকার কানে এল, ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো বিকট গর্জনে প্রভাতের আকাশ বিদীর্ণ হতে লাগলো। একখানা কুড়ুল হাতে করে সে আমার বাবা লাবান্‌কে খুঁজে ফিরছিল। মত্ত জামাতাকে দেখে বাবা ভয়ে বিবশ হয়ে পড়েছিলেন। প্রভু, মাটীতে বসে পড়ে তোমার পবিত্র নাম জপ করছিলেন তিনি। প্রভু, তোমার কাছে বাবাকে আবেদন করতে শুনে, আমার পড়ন্ত সাহস আবার দৃঢ় হ'ল, আমার সঙ্কল্প স্থির হ'ল। বাবাকে

বাঁচাবাব জন্যে, আমার প্রেমিকের সমস্ত রাগটা আমার উপব টেনে নেবার জন্যে, আমি লাবান ও জ্যাকবের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জ্যাকবের মাথায় তখন খুন চড়েছে। আমি তাকে প্রবঞ্চনা করতে সহায়তা করেছি ব'লে, আমার উপর চোখ পড়া মাত্র সে আমার মুখে এক ঘুঁসি মারলো, আমি পড়ে গেলাম। প্রভু, তুমি জানো, তার দেওয়া শাস্তি আমি খুশী মনেই গ্রহণ করেছিলাম। আমি বুঝতাম, আমায় খুব বেশী ভালোবাসে ব'লেই সে এতো বেশী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ও যদি সেদিন আমায় মেরেও ফেলতো,—আমায় মাববাব জন্যে সে তো কুড়ুল উঠিয়েছিল—তোমার সিংহাসনেব কাছে এসে নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আমি করতাম না।

"তার পায়ের কাছে রক্তাক্ত-অবস্থায় আমায় পড়ে থাকতে দেখেই কিন্তু তাব করুণা হ'ল। আমাব উপর নুইয়ে পড়ে সে সস্নেহে আমার ঠোঁটেব বক্ত চুষে নিল। আমার খাতিরে সে আমার বাবা লাবনকে ক্ষমা কবলো, লিয়াকে তার তাঁবু হতে তাড়িয়ে দিল না। এক সপ্তাহ পরে, বাবা আমাকে জ্যাকরের হাতে দিলেন, তার দ্বিতীয়া পত্নী ব'লে জ্যাকব আমাকে অন্তঃসত্বা করলো। আমি তার বহু সন্তান ধাবণ করলাম, সন্তানদিকে আমি বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করলাম, তাদের আমি তোমাব চুক্তির কথা শোনালাম, তাদের ব'লে দিলাম, দুর্দিনে তোমায় ডাকতে, তোমার অপূর্ব নামেব রহস্যের উপর নির্ভর করতে। প্রভু, সর্বশক্তিমান তুমি, সর্বকারুণিক তুমি, আজ আমার নিজের পরমপ্রয়োজনের দিনে তোমায় মিনতি করছি, জ্যাকব সেদিন যা করেছিল তুমি তাই করো। তুমি র‍্যাচেলের সন্তানসন্ততির উপর করুণা করতে পারবে না? আমি যেমন ধৈর্য ধরেছিলাম, তুমি তেমনি ধৈর্য ধরতে পারবে না? আমাদের পবিত্র পুরীকে রেহাই দিতে পারবে না? প্রভু, ওদের করুণা করো, জেরুজালেমের উপর কৃপাদৃষ্টি দাও।"

স্বর্গের ছাদ বেয়ে র‍্যাচেলের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে গেল। তার জোর

শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, অবসন্ন হ'য়ে সে জানুর উপর ব'সে পড়লো, তার কম্পমান দেহ ঘিরে কালো বন্যার মতো চুলগুলো এলিয়ে পড়লো। র‍্যাচেল ভগবানের জবাবের প্রতীক্ষায় রইলো।

ভগবান উত্তর দিলেন না। তিনি স্তব্ধ হয়ে থাক্‌লেন। স্বর্গে, মর্তে, স্বর্গমর্তের মধ্যেকার যতো ঘূর্ণ্যমান্ লোকে, ভগবানের স্তব্ধতার মতো এমন ভীষণ জিনিষ আর কিছুই নাই। ভগবান স্তব্ধ থাকলে সময়ের গতি থেমে যায়, আলোক অন্ধকারে মগ্ন হয়, দিন রাত্রে ডুবে যায়, সমগ্র বিশ্ব ব্যেপে সৃষ্টিব পূর্বেকার বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। জঙ্গমেব গতি থাকে না, নদীর প্রবাহ নিশ্চল হয়, ফুল ফোটে না, এমন কি, ভগবানের আদেশ ব্যতিরেকে সাগবে জোয়ার ভাটাও হয় না। কোনো মবজীবের কান ভগবানের এ স্তব্ধতা সহ্য করতে পারে না। কোনো মরজীবের হৃৎপিণ্ড এই ভয়াবহ শূন্যতায় স্পন্দিত হয় না। সে শূন্যে কিছুই থাকেনা, শুধু ভগবান ছাড়া। প্রাণের প্রাণ হ'য়ে ভগবান নিজেও যেন এমনভাবে স্তব্ধ থাকবার সময় সজীব থাকেন না।

তাব বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে ভগবানের এই অন্তহীন স্তব্ধতা, তাব যতো ধৈর্যই থাক্—র‍্যাচেল আর সইতে পারলো না। আবার সে অলক্ষ্যেব দিকে চোখ তুললো, আবার তার মাতৃহস্ত উপরে উঠলো, বাগে তাব মুখ হতে অগ্নিগর্ভ বাক্যধারা দুর্দমনীয় বেগে নির্গত হতে লাগল :—

"সর্বত্র বিদ্যমান তুমি, আমার কথাগুলো তুমি কি তবে শুনতে পাওনি? সর্বজ্ঞ তুমি, আমার কথা কি তুমি বুঝতে পারো নি? তোমার দাসীকে কি আরও সহজ ক'রে বুঝিয়ে বলতে হবে? তাহলে শোনো, কানে একটু খাটো হচ্ছো তুমি! জ্যাকব আমার প্রাপ্য আমার দিদিকে দেওয়ায় আমার হিংসা হয়েছিল, যেমন আমার সন্তানরা তোমার প্রাপ্য বলি তুমি ছাড়া অন্য ভগবানকে দেওয়াতে তোমার হিংসা হয়েছে। কিন্তু আমি দুর্বল মেয়ে-মানুষ হয়েও তোমার খাতিরে আমার হিংসাকে জয় করেছিলাম। আমি

লিয়াকে দয়া করেছিলাম, তাই জ্যাকব আমার উপর দয়া করেছিল। সর্বশক্তিমান! এটা খেয়াল ক'রে দেখো, আমরা সাধারণ জীব হ'য়েও হিংসার কুপ্রবৃত্তি দমন করেছিলাম। আর তুমি? সর্বশক্তিমান তুমি, বিশ্বস্রষ্টা তুমি, বিশ্বের আদি ও অন্ত তুমি, আমরা বিন্দুর অধিকারী হলে, সমুদ্রের অধিকারী তুমি,—তবুও তুমি দয়া দেখাতে পারছ না? আমি ভাল ক'রেই জানি আমার সন্তানরা বড একগুঁয়ে, তারা বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু তুমি ভগবান, প্রাচুর্যের স্বামী তুমি, তোমার তিতিক্ষা কেন তাদের একগুয়েমির বরাবর যাবে না? তোমার ক্ষমা কেন তাদের অবাধ্যতার সঙ্গে তালরেখে চল্‌বে না? এমনতো হওয়া উচিত নয়, ভগবান, এমনতো একেবারেই হওয়া উচিত নয় যে, তোমার দেবদূতদের সামনে তোমার মাথা হেঁট হবে, তারা যে বলবে 'এককালে একজন মেয়ে—একটা দুর্বল মরজীব—ছিল। নাম তার র‍্যাচেল। সে তার ক্রোধ দমন করেছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান ভগবান বিশ্বজগতের প্রভু হ'য়েও তাঁর ক্রোধ সামলাতে পারেননি।' না ভগবান, এ কখনও হওয়া ঠিক নয়। তোমার করুণা যদি অসীম না হয়, তাহলে তুমিও তো অসীম নও,—তার মানে, তুমি ভগবান নও। আমার চোখের জল দিয়ে যে ভগবানের মূর্তি আমি কল্পনা করেছিলাম, সে ভগবান তুমি নও। আমার দিদির চোখের জলের মধ্য দিয়ে যাঁর কণ্ঠ আমি শুনেছিলাম, তুমি তো সে ভগবান নও। তুমি নিজেই তো 'অদ্ভুত ভগবান।' রাগ, শাস্তি, প্রতিহিংসার দেবতা তুমি, আমি, র‍্যাচেল, প্রেমের ভগবানকে ভালোবেসে এসেছি, কারুণিক ভগবানকে সেবা করে এসেছি, তোমার দেবদূতদের সামনে তোমায় আমি আজ বর্জন করলাম। তারা, তোমার পয়গম্বররা, তোমার কাছে মাথা নোয়াতে পারে। আমি, র‍্যাচেল, মা হ'য়ে তোমার কাছে নত হতে পারবো না। আমি খাড়া হয়ে এই তোমাকে তুচ্ছ করলাম। আমার সন্তানদের উপর তোমার ইচ্ছা খাটানোর আগে, ভগবান, আমি

তোমারই বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি। 'তোমার কথার সঙ্গে তোমার প্রকৃতির গরমিল রয়েছে। তোমার হৃদয়ের সঙ্গে তোমার ক্রুদ্ধ বাক্যের কোনও সঙ্গতি নাই। ভগবান, তোমার নিজের আর তোমার বাণীব মধ্যে পার্থক্য বিচাব করো। তুমি নিজেকে যেমনভাবে জাহির করছো, সত্যিই যদি তুমি তেমনি রাগী আব হিংসুটে ভগবান হও, আমি অন্ধকাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার সন্তানদেব কাছে গিয়ে দাঁড়াবো, তাদের দুর্ভাগ্যের অংশ নেব। বাগী ভগবানের রূপ ধ্যান করবার ইচ্ছা আমাব নাই। হিংসুটে ভগবানের কথা ভাবতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। যার শিক্ষায় আমি চলতে চেষ্টা করেছি, আমি যে ভগবানকে ভালোবাসি, তুমি যদি সেই করুণাব ভগবান হও ত হলে সেই রূপেই আত্মপ্রকাশ করো, নরম হও, আমার সন্তানদিকে রেহাই দাও, জেরুজালেমেব উপব কৃপাদৃষ্টি দাও।"

এই বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ করবার পর, র‍্যাচেলেব আর একটুও শক্তি ছিল না। মৃতেব মতো নিমীলিতনয়নে সে পবমেশ্বরের উত্তরের প্রতীক্ষায় পড়ে বইলো।

পিতৃপুরুষদের, পয়গম্ববদের মনে সন্দেহ ছিল না, ভগবানকে যে পাপাত্মা গালাগালি করেছে তাকে বজ্রাঘাতে দগ্ধ হতে হবে। ভয়ে ভয়ে তাঁরা সবে দাঁড়ালেন। ভীরু চোখে তাঁরা সিংহাসনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। লক্ষণ বোঝা গেল না।

ভগবানের রুদ্রমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে দেবদূতবা তাঁদের ডানার নীচে মাথা গুঁজলেন। তারপর, উঁকি মেবে যে-মেয়েটা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা অস্বীকার করেছে, তাব দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলেন,—তাঁদের মনে হল, র‍্যাচেলেব কপালে যেন একটা জ্যোতিঃ জ্বলছে। জ্যোতিটা যেন তার ভিতর থেকে বেরুচ্ছে, তার গালের উপর অশ্রুবিন্দুগুলো উষার আভায় শিশির যেমন দেখায় তেমনি রক্তিম হয়ে ঝলমল করছে। এ কি ঘটছে? বুঝা দেবদূতরতে

পারলেন। তাঁরা বুঝলেন, ভগবান এই বিদ্রোহিণীকে ভালোবাসেন, তার বেয়ারাপনা আর অধীরতার জন্যেই, মুনিদের পয়গম্বরদের তিনি যেমন ভালোবাসেন, যে-সব ধার্মিক অতি দীনতার সঙ্গে তাঁর কথা মেনে নেয় তাদিকে যেমন ভালোবাসেন একে তার চেয়ে অনেক বেশী ভালোবাসেন। ভয় দমন ক'রে দেবদূতরা ভরসা ক'রে চোখ তুলে চাইলেন, দেখলেন, ভগবানের বিরাট সত্তা ব্যেপে একটা অপূর্ব জ্যোতির্ময় প্রশান্তি ফুটে উঠছে, তাঁর স্মিত হাস্যের সান্ত্বনাময় নীলিমায় আবার স্বর্গের অসীম শূন্যতা ভরে উঠছে। তা দেখে, শ্রেষ্ঠ দেবদূতরা আবার আনন্দে ডানা ঝাপটা দিলেন, তাঁদের ডানার মৃদু ধ্বনিতে আকাশে সঙ্গীত সৃষ্ট হ'ল। ভগবানের মুখের ঔজ্জ্বল্য এত প্রখর হ'ল যে তার তীব্রতায় আকাশ জ্বলতে লাগলো। কোনো মর-জীবের চোখে সে তীব্রতা সহ্য হয় না। দেবদূতরা এক সঙ্গে গান গেয়ে উঠলেন, কবর হতে যারা উঠে এসেছিল সেই মৃতাত্মারা স্তুতিতে যোগ দিল, আর এই মিলিত সঙ্গীতের সঙ্গে এসে মিললো, সর্বশক্তিমান এখনও যাদিকে পৃথিবীতে বাঁচবার জন্যে ডাক দেন নি, তাদের কলকণ্ঠ।

কিন্তু যারা নীচে বাস করে,—পৃথিবীর মরজীবরা,—তারা স্বর্গের এসব ঘটনার সম্বন্ধে উদাসীন রইলো, মাথার উপর কি হচ্ছে, তা তারা কিছুই জানলো না। কালো কাফন গায়ে তারা অন্ধকারে বিষণ্ণ হয়ে মুখ নীচু ক'রেই পড়ে রইলো, তারপর একজন একজন ক'রে তারা টের পেল, ফাগুন হাওয়ার মর্মরের মতো একটা অস্ফুট ধ্বনি কোথা থেকে ভেসে আস্‌ছে। উপরের দিকে চেয়ে তারা অবাক হয়ে গেল: ঘন মেঘরাশি বিচ্ছিন্ন হয়েছে, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এদিক হতে ওদিক পর্য্যন্ত একটা অর্দ্ধবৃত্ত—সাতরঙা রামধনু। মা র‍্যাচেলের চোখের জলের ওপর ভগবানের মুখমণ্ডলের আলো পড়ে এই রামধনুর জন্ম। *

* অন্তিদান গল্প : লেখক—স্টেফান জ্বাইগ্‌।

—মানুষ বুঝি ব্যবহারে—

রাতের পাহারাও'লার মেজাজ তিরিক্ষি দেখাচ্ছিল। এমনিই সে ঢিমে. সেদিন সে আরো ঢিমে হ'য়ে গিয়েছিল। ব'সতে গিয়ে, টবের বাক্সটাও তার কাছে কেমন-যেন বেয়াড়া বোধ হ'ল। মুখে তার গভীর বিষাদ, চোখে কিন্তু একটা অন্তর্জ্বালা ফুটে বেরোচ্ছিল।

হঠাৎ মুখ ফেটে অগ্ন্যুৎগার সুরু হ'ল, "থিয়েটারী। এ-সব থিয়েটারী আমার সহ্য হয় না। কোনোদিন না। জীবনে দু-একবার থিয়েটারে যে যাই নি, তা নয়। তা গিয়েছি, শুধু মনে হয়েছে, চেষ্টা করলে যে কেউ ও-সব করতে পারে। ছেলেখেলা!—স্রেফ ছেলেখেলা। সাজগোজ ক'রে আরকেউ হওয়ার ভাণ।'

একটু তামাক কেটে নিয়ে বাঁ গালে ফেলে সে ব'সে ব'সে চিবোতে লাগলো। তার জ্যোতিহীন চোখদুটো তখন নদীর ওপারের ঘাটের ওপর নিবদ্ধ। মাঝ-নদীতে একজন বাতিও'লা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী ক'রে তার নজর টান্‌বার চেষ্টায় নৌকা থেকে যে ডিগ্‌বাজি খেয়ে পড়তে বসেছে, সেদিকে সে খেয়ালও করলো না।

বহুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বলতে লাগলো, "আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। হন্ত-দন্ত হয়ে পরোপকার করতে না গিয়ে মাথাটা একটু যদি খেলাতাম, আমিও ঠিক থাকতাম, 'লিজী এ্যাণ্ড আনি' জাহাজের ঐ বাঁদর-মুখো

অপদার্থগুলো—ওরা আবার নিজেদের জাহাজী বলে জাহির করে।—ও-দিকেও খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হাসবার জন্যে আব-কিছু দেখতে হ'ত। আধ ক্রোশ ধরে যতো পানশালায় রটিয়ে বেড়িয়েছে, কাল রাতে 'টাউন অব্‌ মাবগেটে' ঢুকেছি এক পেয়ালা টেনে নিতে, দেখি, তিন ছোঁড়া বেড়ার ওপর উঠেছে আমাকে দেখবার জন্যে।

লিজী এ্যাণ্ড আনির মেট্‌ ঐ টেড্‌ সইয়ার ছোঁড়াকে নিয়ে এ-সবের সূত্রপাত। ওটা আবাব মেট্‌! ভগ্নীপতি ক্যাপ্টেন না থাক্‌লে ও মেট হ'ত, না ঢেঁকি হ'ত। এটা-সেটা নিয়ে বার তিন আমার সঙ্গে হয় ওব বচসা। শেষের বার যা বলে গাল দিয়েছিলাম। এখন দেখছি, সেটা একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। ও কি কেউ ভোলে? ওটার মতো বাঁদরের তো কথাই নাই।

এ হ'ল গতবারের আগেবার, ওরা যখন আসে, তখনকার কথা। গত সপ্তাহে ওরা যখন ঘাটে লাগলো, দেখলাম, কথাটা বাছাধন ভোলে নি। প্রথমটা ও ভাণ করেছিল, যেন আমাকে দেখতে পায়নি, তারপর যখন জানিয়ে দিলাম, ফের আমাব পিছনে লাগলে ওব কি হালটা করবো, ওটা বললো 'আ—রে আমার আলুর বস্তা, কাব ফেলে-দেওয়া এক জোড়া ঠ্যাঙে চড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।' ছোঁড়াব মুখটা বড বিশ্রী, ধারালো নয়, বিশ্রী।

তারপর ওর দিকে আমি নজর দিই নি। এতেই ওর রাগ গেল বেড়ে। আমার যা করবার, তাতে অবিশ্যি আমি অবহেলা করিনি। রাত্তির বারটা বাজতে পাঁচ মিনিট থেকে সাড়ে বারটা পর্যন্ত ঘণ্টা বাজিয়ে, তবে সে আমার সাড়া পায়। রাতের পাহারাও'লা অনেকেই বদলা নিতে অমন একটু ঘুমিয়ে পড়ে।

গেট খুলে দেওয়ার পর আধঘণ্টাটেক বকাবকি চললো। অন্ততঃ ওই বকলো। বকুনিতে একটু শ্রান্তি এসেছে, দেখলে, আমি কেবল একটু 'ইস্‌-স্‌'

ক'রে দম দিচ্ছি। শেষে আমার চাল বুঝে ফেলে ও ওদের জাহাজে চলে গেল, যাবার সময় ঘুঁসি উঁচিয়ে জানিয়ে গেল, দেখে নেবে।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা কাজে এসেই, গেটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, যখন ও বাইরে যাবে একটু মুচকি হাসি ওর সঙ্গে দেব। ঠিক মতো হাসতে পারলে, ওর বাড়া আর মার নাই। প্রভুর কিন্তু দর্শন মিললো না। ভুলে এক গাড়োয়ানের ওপর মুচকি হাসির মক্স ক'রে ভেতরে যেতে হ'ল। যখন গেটে ফিরলাম তখন ও চলে গিয়েছে।

শিকার ফস্কেছে। বাইরে এসে গেট-পোস্টে পিঠ রেখে পাইপটা ধরাতে যাচ্ছি, দেখি, একটা ছেলে ব্যাগ হাতে সেদিকে আসছে। সুশ্রী চেহারা, বছর পনরো বয়স, পরনে সার্জের সুট। ছোকরা সরাসরি আমার কাছে এসে হাতের ব্যাগটা নামিয়ে সলজ্জ গোছের একটা হাসি হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'নমস্কার, ক্যাপ্টেন সায়েব।'

আমাকে ক্যাপ্টেন বলে ভুল করেছে অনেকে। ও প্রথম নয়, ওর চেয়ে বেশী বয়সের লোকও।

আমি বললাম, 'নমস্কার।'

ছোকরা একটু কাঁপা গলায় বললো, 'আপনার কেবিন-বয় চাই?'

বললাম, 'কেবিন-বয়? না, আমার দরকার নাই।'

ছোকরা তখন বললো, 'বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি, জাহাজে ঘুরবো ব'লে। হয়তো কেউ পিছন নিয়েছে। ভেতরে যাবো?'

মানা করবার আগেই ও ব্যাগশুদ্ধ গেটের ভেতরে ঢুকলো, আমার বলার অপেক্ষা না ক'রে সিধে অফিসে ঢুকে বুকে হাত চেপে হাঁপাতে লাগলো। বললে, 'আপনার মুখ দেখেই বুঝেছি, আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'বাড়ী থেকে পালিয়েছ কেন, বলো দিকি। বাড়ীতে দুর্ব্যবহার করে বুঝি?'

ছোকরা হাসলো, 'দুর্ব্যবহার করবে আমার সঙ্গে! বাবা হয়তো এতক্ষণে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে, হয়তো পুরস্কার ঘোষণাও করেছে। হাজার হাজার টাকার জন্যেও বাবা আমাকে কাছছাড়া করবে না।'

অমনি আমার কান খাড়া হয়ে উঠলো, তা' মানছি। সবারই হ'ত। তা' ছাড়া, ছেলেটাকে বাপের কাছে নিয়ে যাওয়া একটা সৎকাজও তো! একটু ভেবে নিলাম, কেমন ক'রে তা করি।

ডেস্কের পিছনে মেঝের ওপর খান তিন চার লেজার বই ফেলে বললাম, 'বসো, ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা যাক।'

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে বাগ মানাতে পারলাম না। ওর মাথায় তখন প্রবাল দ্বীপ, বোম্বেটে, আর বিদেশী বন্দর বাসা বেঁধেছে। সারা পৃথিবী দেখবে, পৃথিবী আর উড়ুক্কু মাছ।

ছোকরা বলছিল, 'ফুলে ফুলে-ওঠা নীলজলের ঢেউ—ওই আমার চাই।'

উঁচু ঢেউ-এর মজাটা কি রকম, তাকে বোঝাতে গেলাম। কে শোনে? লেজারগুলোর ওপর বসে আমার দিকে চেয়ে ও কাঠের মূর্তির মতো মাথা নাড়তে লাগলো। ঝড়ে কতো জাহাজ ডুবে যায়, বলতে গিয়ে দেখি, উত্তেজনায় ও ঠোঁট কামড়ায়, আনন্দে ওর চোখদুটো জ্বলে ওঠে। বুঝলাম, বোঝানোর কর্ম নয়, হাল ছাড়ার ভাণ করলাম।

বললাম, 'দেখো, আমার এক বন্ধুর জাহাজে তোমার জায়গা ক'রে দিতে পারি, তবে তোমার বাপ-বেচারার মনের বোঝাটাও নামানো দরকার। তোমার কি হ'ল সে-খবরটা তাঁকে জানিয়ে দেবো, কেমন?'

ছোকরা চট ক'রে জবাব দিল, 'আমাদের জাহাজ ছাড়ার আগে নয়।'

বললাম, 'তা আর বলতে। দাও তোমার বাপের নাম-ঠিকানাটা, ব্লু-শার্ক জাহাজ—যে জাহাজে তুমি যাবে—চলে গেলে, তোমার বাবার কাছে একটা বেনামী পত্র ছেড়ে দেবো'খন, তুমি কোথায় গেলে সেটা জানিয়ে।'

Old Boys'

প্রথমটায়, কথাটা ওর মনে ধরলো না, বললো, সে নিজেই লিখবে। যখন বোঝালাম, ও ভুলে যেতে পারে, তা ছাড়া, আমার একটা দায়িত্ব থাকছে তখন সে রাজী হ'য়ে জানালো, ওর বাপের নাম মিঃ ওয়াটসন্, কমার্সিয়াল রোডের ওপর তাঁর বড়গোছের একটা কাপড়ের দোকান আছে।

তার সন্দেহ মেটাতে, খানিকক্ষণ এটা-সেটা কথাবার্তা ক'য়ে তাকে বললাম, 'ঐ মেঝের ওপরেই বসে থাকো, জানলা দিয়ে যেন কেউ না দেখতে পায়। ক্যাপ্টেন-বন্ধুটার সঙ্গে দেখা ক'রে সব ব্যবস্থা ক'রে আসছি।'

বাইরে এসে কি করা যায় স্থির করবার চেষ্টা করলাম। ঘাট ছেড়ে যাওয়া চলে না, ওদিকে ছেলেটার বাপেরও দুশ্চিন্তা দূর করা দরকার। ভাবতে ভাবতে একপাশ ঘেঁসে এগিয়ে চললাম। ছেলেটা দেখছে কিনা দু-একবার ফিরে দেখে, ছুটলাম কমার্সিয়াল রোডে।

বয়স হয়েছে। তার ওপর, সেদিন সন্ধ্যেয় গরমও পড়েছিল। বাস ভাড়ার পয়সাও ছিল না। সারাটা পথ হেঁটে যখন পৌঁছলাম, ঘেমে নেয়ে উঠেছি। বেশ বড়-সড় দোকান। কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে জনতিন-চার ডাগর মেয়ে কাজ করছে। ক'টা চেয়ার পড়ে আছে, পায়াগুলো লম্বা, বসবার জায়গাটা এতটুকু। একটা মেয়ের কাছে গিয়ে বললাম, 'মিঃ ওয়াটসনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। বললাম, ব্যক্তিগত কথা আছে। খুব জরুরী।'

মেয়েটা আমার দিকে একবার চেয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে একটা লম্বা মতো, টেকো লোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরলো। লোকটার গালে হালফ্যাসানের দাড়ি, নাকটা প্রকাণ্ড। আমাকে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি চান ?'

বললাম, 'একটা গোপনীয় কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

লোকটা রুক্ষভাবে বললো, 'এই যথেষ্ট নিরিবিলি! চট ক'রে বলে ফেলো দিকি, কি চাও ?'

একটু গা ঝাড়া দিয়ে আমি তার দিকে চাইলাম, বললাম, 'ওঃ, এখনও তার খোঁজ হয়নি বুঝি ?'

দোকানী খেঁকিয়ে উঠলো, 'খোঁজ হয়নি ? কার খোঁজ ?'

'তোমার ছেলের, তোমার নীল-চোখো ছেলের।' ব'লে, সোজা তার চোখের দিকে তাকালাম।

ও রাগে তোৎলাতে লাগল, 'ভাল চাও তো সরে পড়। এখানে চালাকি মারতে এসেছ, না ? মৎলবটা কি ?'

আমি চ'টে গেলাম, 'মৎলব হচ্ছে এই: তোমার ছেলে জাহাজে পালাচ্ছে, আমি এসেছিলাম, তোমায় তার কাছে নিয়ে যেতে।'

লোকটা ভয়ানক ঘাবড়ে গেল, মনে হল, এখনি মূর্চ্ছা যায়। হবারই কথা। দেখলাম, যে মেয়েটা সবচেয়ে সুন্দরী, সে আর অন্য একটী মেয়েও মূর্চ্ছা যায়-যায় হ'য়ে বহুকষ্টে সাম্‌লে নিচ্ছে।

শেষে, লোকটীর মুখে কথা ফুটলো, 'দোকান থেকে বেরোও, নয়তো হাজতে ভরবো।'

আমি বেশ শান্তভাবেই বললাম, 'ভাল। তবে একটা কথা শুনে রাখো, ছেলেটা যদি ডুবে-টুবে মরে, এখন তো মেজাজ নষ্ট করছ, তখন আপশোষের সীমা থাকবে না, রাতের ঘুম কাকে বলে জানবে না। ভ্যানা, ওর মায়ের কথাটাও তো ভাবো।'

এক ছুঁড়ী ভিজে আতসবাজির মতো একবার ফ্যাঁস্‌-স্‌ ক'রে উঠলো। ওয়াটসন সায়েব রাগে প্রায় দমবন্ধ হ'য়ে ধাক্কা দিয়ে আমাকে দরজার বা'র ক'রে দিল। প্রথমটা তার ব্যাভারখানা বুঝতে পারিনি। পরে, ছুঁড়ীগুলোর একটা আমায় বললো, সায়েব বে-ই করেনি, ছেলেপুলে আসবে কোত্থেকে ? কেউ তোমাকে ভালোমানুষ পেয়ে হয়তো নাজেহাল করছে। বললো, 'ওয়াটসন সায়েব ফেরবার আগেই গড়াতে গড়াতে সরে পড়ো, বাপু।'

আর এক ছুঁড়ী বললো, 'এমন লোককেও একা বাড়ীর বা'র হতে দেয়! কোথায় থাকো, ঠাকুর্দা ?'

বুঝলাম, ঠকেছি। কানে কম শোনার ভাণ ক'রে দোকান থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় ওয়াটসন সায়েব একটা চ্যাংড়া পুলিশ সঙ্গে ক'রে ফিরে এল। পুলিসটা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি মৎলবে দোকানে ঢুকেছিলে হে? বেরোও!' এই না ব'লে সেটা আমার ঘাড়ের ওপর সত্যিসত্যিই দুটো হাত চাপিয়ে ধাক্কাতে লাগলো। তা, ও বেটা ধাক্কা দিয়ে আমায় বা'র করতে পারবে কেন? একটু কেবল নড়ালো।

ছেলেটাকে একবার দেখে নেব, ভেবে বেরোলাম। পুলিসটা অনেক দূর পর্য্যন্ত আমার পিছু পিছু এল, যাবার সময় মুড়ো নেড়ে হুঁসিয়ার ক'রে গেল।

ভুল 'বাসে' উঠে কমার্সিয়াল রোড থেকে আলড্‌গেটে নামতে হ'ল। লাভ হ'ল না বড়। জাহাজঘাটে যখন এসে পৌছলাম, একেবারে শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। দু-এক মিনিট বাইরে দাঁড়িয়ে দম নিয়ে, রাগে ফুলতে ফুলতে ভেতরে ঢুকলাম।

ওই যে বলে, পালকের ঘায়ে বসিয়ে দেওয়ার অবস্থা, আমার হ'ল তাই। অফিসে ঢুকে আমার বাক্যরোধ হয়ে গেল। ছোকরা ভেগেছে, তার জায়গায় মেঝেয় বসে একটা সুন্দরপানা মেয়ে। বয়স হবে আঠার-উনিশ, চুল ছোট, পরণে সাদা ব্লাউস।

আমাকে দেখে মেয়েটা ধড়মড়িয়ে দাঁড়ালো, দুটো ভীরু চোখ মেলে বললো, 'নমস্কার, আমার ভাই আপনার সঙ্গে চালাকি করেছে· ব'লে আমি দুঃখিত। ছেলেটা দুষ্টু, সয়তান, অকৃতজ্ঞ। আপনাকে বলেছে কিনা, তার বাবার নাম ওয়াটসন! আপনি তাঁর কাছে গিয়েছিলেন বুঝি? আশা করি, ক্লান্ত হয়ে পড়েননি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় সে?'

মেয়েটা মাথা নেড়ে বললো, 'ভেগেছে কোথায়। এতো মানা করলাম, শুনলো না। বললো, আপনি হয়তো ওর ওপর চটেছেন। যাবার সময় ব'লে গিয়েছে, বুড়ো নাড়ুগোপালকে আমার ভালবাসা দিও, তাকে বোলো, তার ওপর আমার বিশ্বাস নাই।'

মেয়েটাকে এতো সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল যে, তাকে কি বলি, ভেবে পেলাম না। একটুক্ষণ বাদে, পকেট থেকে একটা রুমাল বা'র ক'রে সে কাঁদতে লাগলো।

মেয়েটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, 'তাকে ফিরিয়ে আনুন আপনি। এতদূর তার পিছন ছুটলাম এরি জন্যে ? আমার খাতিরে আর একটীবার চেষ্টা ক'রে দেখুন।'

আমি বললাম, 'কোথায় গিয়েছে জানি না, কেমন করে তাকে ফিরিয়ে আনবো ?'

মেয়েটা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললো, 'ওর ধর্মবাবার কাছে—তাঁর বাড়ী। দিব্যি গেলেছিলাম, কাউকে বলবো না। কিসে যে ভাল হয়, বুঝি না।'

বললাম, 'ওর ধর্মবাপ ওকে ধরে রাখবে'খন।'

মেয়েটা মাথা নেড়ে বললো, 'তাঁকে জাহাজে যাওয়ার কথা বললে তো! ও গিয়েছে, কিছু টাকা ধার করবে ব'লে।'

মেয়েটা ফোঁপাতে লাগলো। তার কাছ থেকে কোনোমতে ছেলেটার ধর্মবাপের নাম-ঠিকানা জোগাড় ক'রে নিলাম। ওই ঠিকানা পেতেই যা বেগ পেয়েছি, ভাবতে মূর্চ্ছা আসে। যা হোক, ফোঁপানির ফাঁকে ফাঁকে, তার কাছ থেকে জানলাম, নাম মিঃ কিড্ডেন্স, ২৭নং ব্রিজ ষ্ট্রীটে বাড়ী। মেয়েটী বললো, 'লোকটার দয়ার শরীর, অমন উদার লোক বড় দেখা যায় না। হ্যারি ভাইটী সেইজন্যেই তাঁর কাছে গিয়েছে। খুনী হয়ে তিনি যদি আপনাকে কিছু দিতে চান, 'না' করবেন না। তাঁর অঢেল ধন।'

এবার ব্রিজ ষ্ট্রীট গেলাম একটু ধীরে সুস্থে। সন্ধ্যেটা কিন্তু ছিল বড় গরম। যখন পৌছলাম, অবস্থা ঘায়েল। একটা ছিমছাম ভদ্রচেহারার মেয়ে এসে দরজা খুললো। মেয়েটা কিছু কালা। বার দশ-বারো নামটা চেঁচিয়ে বলার পর, সে শুনতে পেল। বললো, 'তিনি তো এখানে থাকেন না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'বাড়ী বদলেছেন বুঝি ?'

মেয়েটী মাথা নেড়ে আমায় দাঁডাতে ব'লে ভেতরে চলে গেল, স্বামীকে ডেকে নিয়ে এল। লোকটী বললো, 'ও-নাম কখনও শুনিনি। আজ সতর বছর এ বাডীতে বাস। নম্বরটা ঠিক আছে তো ? ২৭নং ?'

বললাম, 'নিশ্চয়।'

'না, তিনি এখানে থাকেন না। ৩৭ কি ৪৭ নম্বর বাডী খোঁজ করতে পারেন।'

করলাম খোঁজ। সাঁইত্রিশ নম্বর বাড়ী খালি, সাতচল্লিশ নম্বরে একটা চিম্‌সে-মুখো ছোঁড়া কিড্‌স্‌ নাম শুনে তো হেসেই কুটীকুটী। এতক্ষণ খেয়াল হয় নি, কিন্তু আমায় এমন ক'রে ধাপ্পা দেওয়া বড় শক্ত। এক নিমিষে বুঝে নিলাম, আবার ঠকেছি। ছুঁড়ীটা ছোঁডার চেয়ে কম পাজী নয়।

ঘুরে ঘুরে অবস্থা যা হয়েছিল! কোনোমতে পা টেনে টেনে পৌছলাম। মাথা বিলকুল ঘুলিয়ে গিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে নিতে, বার তিন-চার দাঁড়ালাম। পারলাম না। শেষে, প্রায় গড়াতে গডাতে অফিসে ঢুকলাম।

যা ভয় করছিলাম তাই! অফিস-ঘর শূন্য। ছোঁড়া-ছুঁড়ীর পাত্তা নাই। ধপ্‌ করে একটা চেয়ারে ব'সে ভাবতে লাগলাম, এ-সবের মানেটা কি। হঠাৎ জানলা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তে দেখি, কে যেন জেটীর এপাশ ওপাশ ছুটে বেড়াচ্ছে।

সামনে কত-কি থাকায়, ভাল দেখা গেল না। বাইরে বেরিয়ে যা দেখলাম,

তাতে চক্ষু স্থির। সেই ছোঁড়াটা পাগলের মত হাত মচকাতে মচকাতে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আমায় দেখে কোথায় পালাবে, না, ছুটে এসে তার নোংরা থাবাদুটো দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো! বললো, 'বাঁচান, ওকে বাঁচান! বাঁচান!'

আমি তাকে ঝেড়ে ফেলে বললাম, 'দেখো বাপু!'—

ছেলেটা রীতিমত নাচতে লাগলো, বললো, 'জলে পড়ে গিয়েছে, আমার দিদিমণি। শীগগির! আমি যে সাঁতার জানি না।'

ও ছুটে জলের ধারে গিয়ে জলের মধ্যে একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখালো, জলে তখন ভর-জোয়ার। আমার হাতটা ধরে' পিছনে একটা ঠেলা দিয়ে বললো, 'জল্‌দি! ঝাঁপিয়ে পড়ুন! দেখছেন কি?'

আমি হতভম্ব হয়ে জলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। তারপর দেওয়াল হতে একটা লাইফ-বেল্ট নামিয়ে ছুঁড়ে দিলাম জলের ওপর। একটু ভেবে নিয়ে, 'লিজী এ্যাণ্ড আনি' জাহাজটা ঘাটের কাছেই আছে দেখে, তার কাছে গিয়ে চীৎকার ক'রে এক ডাক ছাড়লাম। গলা আমার বরাবরই খুব দরাজ। একডাকেই ক্যাপ্টেন আর হেড্ সইয়ার কেবিন থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল, খালাসীরাও এসে জুটল।

আমি চীৎকার ক'রে বললাম, 'একটা মেয়ে জলে পড়েছে।'

ক্যাপ্টেন শুধু জিজ্ঞেস করে নিল, কোথায়। তারপর, ক্যাপ্টেন, মেটছোঁড়া আর জাহাজের অন্য লোকগুলো তাড়াতাড়ি তাদের নৌকায় উঠে ঘাটে এসে লাগলো। ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে আমি দৌড়ে ফিরে এলাম, আর দশজনের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

ক্যাপ্টেন বললো, 'ঠিক কোন জায়গা, দেখাও দিকি।'

ছেলেটা আঙুল দিয়ে দেখালো। ক্যাপ্টেন নৌকার ওপর খাড়া হ'য়ে জাহাজী-কাঁটা ফেলে চারপাশ দেখতে লাগলো। দুবার বললো, 'কি

যেন ঠেকছে'। নাঃ, ভুল। তার মুখ ক্রমে ভারী হতে থাকলো, মাথা নেড়ে জানালো, কাঁটা ফেলে কোনো লাভ নাই।

ছেলেটাকে লক্ষ্য ক'রে ক্যাপ্টেন বললো, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদো কেন? কেঁদ না।' তারপর একজনকে ডেকে বললো, 'জেম্‌স্‌, টেম্‌স্‌ পুলিশকে খবর দাও। ওরা কাঁটাজাল আনুক। ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, মনটা ঘুরে থাকবে।'

ওরা চলে গেলে ক্যাপ্টেন আর একবার কাঁটা ফেলে দেখলো। তারপর আশা ছেড়ে নৌকায় ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

আমার দিকে মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেন বললো, 'পাহারাওলা, ল্যাঠা হ'ল তোমার। এত সব কাণ্ড হ'ল, তুমি ছিলে কোন চুলোয়?'

জাহাজের রাঁধুনে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সে তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'সারা সন্ধ্যে ওর দেখা নাই। ও ঠিকমত ডিউটী দিলে, মেয়েটা কি আর ডুবে মরে। জাহাজঘাটে মেয়েটা এলই বা কিসের জন্যে?'

মেট বললো, 'হয়তো একটু ফূর্তি করতে। আরও যে ডুবে মরে না, এইটাই আশ্চর্য। সারা সন্ধ্যে পাহারাওলা থাকবে তাড়িখানায় পড়ে, হবে না এমন?'

রাঁধুনে বললো, আমাকে ফাঁসিতে লটকানো উচিত। তার পাশের এক ছোকরা—মামুলী জাহাজী—সে বললো আমাকে পুড়িয়ে মারাটাই সঙ্গত। এ নিয়ে হয়তো ওদের মধ্যে একটু কথা কাটাকাটিও হয়েছিল। আমার যা মনের অবস্থা তখন, অতো লক্ষ্য করিনি।

ক্যাপ্টেন আমার দিকে চেয়ে একটু মাথা নেড়ে বললো, 'অমন মনমরা হলে মেয়েটা তো আর ফিরে আসবে না। আমার কেবিনে গিয়ে বরং একটু হুইস্কি খেয়ে এসো। বোতলটা টেবিলের ওপরেই আছে। পুলিস এলে, মাথা ঠিক রাখার দরকার হবে। আর যা করো, যা-তা ব'লে নিজেকে দোষের ভাগী ক'রে বোসো না।'

রাঁধুনে বললো, 'আমরা আছি কি জন্যে? দেব না ফাঁসিয়ে?'

মামুলী জাহাজীটা বললো, 'আমি যদি ঐ মেয়েটা হ্‌তাম, রোজ রাতে ভূত হয়ে ওর জীবনভোর ওর সামনে এসে দাঁড়াতাম, গা বেয়ে জল ঝরতো, গোঙাতাম।'

রাঁধুনে বললো, 'ওই যে করবে না, কে বলতে পারে? আশা করি, মেয়েটাও তাই করবে।'

আমি তাদের কথার কোনো জবাব দিলাম না। শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভূতের ভয় আমার ভয়ানক, এমন একটা কাণ্ড হ'য়ে যাওয়ার পর এই জাহাজ-ঘাটে একা-একা রাত কাটাতে হবে, ভেবেই তো আধমরা হ'য়ে গিয়েছিলাম। যাক্‌, 'লিজী এ্যাণ্ড আনি'র কেবিনের টেবিলে ক্যাপ্টেনের কথামতো এক বোতল হুইস্কি পেলাম। 'লকারে' বসে এক গ্লাস খেয়ে নিয়ে উদ্বেগের সঙ্গে ভাবতে লাগলাম, এ-সবের শেষ হবে কোথায়?

পেটে হুইস্কি পড়তে শরীর-মন কতকটা চাঙ্গা হ ল। আর এক গ্লাস ঢালবার জন্যে বোতল উঠিয়েছি, শুনলাম, ক্যাপ্টেনের কামরা হ'তে একটা অস্পষ্ট শব্দ আসছে। বোতল নামিয়ে, কান খাড়া ক'রে রইলাম, সব নিঝুম। বোতল তুলে একটু ঢেলেছি—পরিষ্কার শুনলাম, একটা হিস্‌-হিস্‌ আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে গোঙানী!

কিছুক্ষণ একেবারে পাথর হ'য়ে গেলাম। তারপর, বোতলটা আস্তে নামিয়ে যাবার জন্যে গা তুলেছি, হঠাৎ 'ষ্টেট-রুমে'র দরজা খুলে গেল। দেখলাম, আমার সামনে সেই ডুবে-যাওয়া মেয়েটা, মুখ চুল সব ভিজে, জল গড়াচ্ছে।

টেড্‌ সইয়ার চারদিকে বলে বেড়িয়েছে, আমি নাকি কেবিন থেকে ডেকে উঠে এসেছিলাম, মা-হারা বাছুরের মতো চীৎকার করতে করতে। সারা সন্ধ্যেবেলা আমার মতো কাটালে, ওটা কি করতো দেখে নিতাম।

জেটীতে যখন এসে পৌছলাম, ওরা সবাই তখন সেখানে। আমি একেবারে ক্যাপ্টেনের বাহুর মধ্যে লুটিয়ে পড়লাম। সকলে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, কি হয়েছে? কি হয়েছে? একটু দম নিয়ে, সব বললাম। ওরা হাসতে লাগলো, এক রাঁধুনে ছাডা। সেটা বললো, হবেই তো এমনি। তাবপব, যেন স্বপ্নের মতো দেখলাম, মেয়েটা জাহাজের সিঁডি বেয়ে উঠলো, আস্তে আস্তে এপাশে এগিয়ে এল।

আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম, ঐ দেখ, ঐ যে মেয়েটা দাঁডিয়ে।'

ক্যাপ্টেন বললো, 'স্বপ্ন দেখছো তুমি। কই, কেউ তো নাই।'

সবারই ঐ এক কথা। মেয়েটা ঘাটে এসে উঠলো, তবুও ঐ এক কথা। মাজা ধবে আমার উদ্দেশে বিশ্রী মুখভঙ্গী করতে কবতে ক্রমে সে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। ওরা জনপাঁচেক মিলে এখন আমাকে ধবে বাখতে পাবে না। চারপাশে ঘাট্-টাট্ সব বন্‌বন্ ক'রে ঘুবতে লাগলো। ছুঁড়ীটা কাছে এসে, আমার গালে আস্তে আস্তে ক'টা টোকা মাবলো।

বললো, বেচারী বুঢ়ুয়া! কি লজ্জাব কথা, টেড্। বড থারাপ!

আমায় ছেড়ে ওরা হেসে সারা জেটী পা-দাপাদাপি ক'বে মরে আর কি! যদি বুঝতো কি বিশ্রী দেখাচ্ছিল ও-দিকে, যদি বুঝতো আমি তাদিকে কি বকম করুণার চক্ষে দেখছিলাম, তা' হলে বোধ হয় অমনটা করতো না।

হাসি একটু থামিয়ে, টেড সওইয়ার চোখ মুছে মেয়েটাব কোমর জড়িয়ে ধরে বললো, 'ইনি হলেন আমার ভাবী বৌ—কুমাবী ফ্লোরি প্রাইস্। কেমন চালাক বল তো?'

আমি বললাম, 'আমার মত আমার কাছেই থাক্, মেয়েদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না। শুধু, একবার ওর ভাই-ছোঁড়াকে পেলে—'

ওরা এবার আরও জোরে হাসতে লাগলো। তারপর রাঁধুনে তার হাড়-জিগডিগে হাতখানা দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে কি সব

বকতে লাগলো। যত ঝেড়ে ফেলতে চাই, তত বকে। আমার কাছে সব তখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। একটু ভাববার সময় পেলে, আগেই বুঝে ফেলতাম। রাগ কারও ওপর আমার নাই। তবে, হাঁ, এইটুকু বলি, টেড সইয়ারের সঙ্গে বে' হওয়ার বাড়া শাস্তি আমি মেয়েটার জন্যে কামনা করি না।" *

* ইংরাজী গল্প : লেখক—ডব্‌লু, ডব্‌লু, জ্যাকব।

— মিৎসারোর কাক —

ছুটীর দিনে একদল রাখাল মিৎসারোর খাড়া পাহাড়টায় উঠতে উঠতে দেখতে পেল, একটা পাখীর বাসা, মস্ত একটা কাক সেখানে চুপ ক'রে ব'সে ডিমে তা দিচ্ছিল। হৈ হুল্লোড় ক'রে রাখালরা কাকটাকে ধরে ফেললো :—

"কি বাপধন, এখানে কি করছিলে ব'সে ব'সে? ছাখ্, ছাখ্, মশায় ব'সে ব'সে ডিমে তা দিচ্ছিলেন। দেখো বাপু, ও কাজটা তোমার বিবির, তোমার নয়, বুঝলে?"

বলাবাহুল্য, কাকটা নিজের আচরণের অজুহাত কিছু একটা দিল, কিন্তু কাকীয় ভাষায় ব্যক্ত হওয়ার দরুণ তার যুক্তি রাখালদের বোধগম্য হ'ল না। সমস্ত দিনটা রাখালরা কাকটাকে নিয়ে খুব আমোদ করলো, আর শেষ পর্যন্ত তাদের একজন সেটাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। পরের দিন, সেটাকে নিয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে, তার গলায় ছোট্ট একটা ঘণ্টা বেঁধে সে কাকটাকে ছেড়ে দিল : "দূর হ, যা খুশী করগে।"

* * *

টুং-টাং-করা দোলকটা গলায় বাঁধা থাকায় কাকের মনোভাব কি হ'ল, তা কাকই জানে। ঘণ্টা বাজিয়ে সে ঊর্ধ্ব আকাশে উড়ে বেড়াত, তার এই ঊর্ধ্ববিহার দেখে বিচার করলে মনে হয়, গলায় ঘণ্টা বাজতে থাকায় তার বেশ মজাই লাগতো,—তা নইলে নিজের বাসার কথা, নিজের সঙ্গিনীর কথা অমন ক'রে ভুলতে পারতো কখনও?

"টুং—টাং—টুং"

মাটীর দিকে মাথা নুইয়ে কাজ করতে করতে ঘণ্টার আওয়াজ শুনে চাষীরা খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতো। চারদিকে অন্তহীন রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠ, চোখ পিট্ পিট্ ক'রে দূরের দিকে চেয়ে তারা এ-ওকে জিজ্ঞেস করত—"ঘণ্টা বাজছে কোথায় হে?"

হাওয়ার নাম গন্ধ নাই। এখানে, এই মাঠের মধ্যে যে-গির্জাটী হতে ঘণ্টার এই মিষ্টি আওয়াজ ভেসে আসছে, সেট নিশ্চয়ই অনেক দূরে হবে, কিন্তু এ কোন্ গির্জা?

ঘণ্টার শব্দ নিয়ে ওদের মধ্যে নানারকম জল্পনা কল্পনা চলতো। ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি, এই শব্দের উৎস তাদের মাথার উপরেই খুব উঁচুতে-ওড়া একটা কাক।

কিচে কাজ করতো তার নিজের ক্ষেতে—একেবারে একলা। তার মনে হ'ল, "এ নিশ্চয়ই কোনো উপদেবতার কাজ!" সার দেবার জন্যে সে বাদাম গাছগুলোর গোঁড়া খুঁড়ছিল,—কথাটা মনে হতেই বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি ক'রে সে ইষ্টদেবতা যিশুকে স্মরণ করলো। ভূত প্রেতে তার অগাধ বিশ্বাস। কতদিন মাঠ হতে রাত করে বাড়ী ফেরার সময়, বড় রাস্তা ধরে যেতে পুরোনো ইটের পাঁজাটার কাছে পৌঁছুলে ও শুনেছে, কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। কে না জানে ইটের পাঁজায় ভূতরা আড্ডা বাঁধে। কিচে ওদের ডাক স্পষ্ট শুনেছে: কিচে! ও কিচে! ঠিক ঐরকম! শুনে টুপির নীচে তার মাথার চুল কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

কিচের কানে এল ঘণ্টার আওয়াজ, প্রথমে একটু দূরে, তারপর কাছে,—আবার, অনেক দূরে। চারপাশে কয়েক ক্রোশের মধ্যে জনমানব নাই, শুধু মাঠ আর গাছপালা। তারা না পারে কথা বলতে, না পায় কিছু শুনতে। তাদের এই নিশ্চুপ ভাব দেখে কিচের ভয় বেড়ে যায়।

দেখতে দেখতে জলখাবার সময় হয়। সকালবেলা বাড়ী থেকে সে একটা থলেতে ক'রে খাবার এনে, দূরে একটা অলিভ গাছের ডালে নিজের কোটের সঙ্গে সেটা ঝুলিয়ে রেখেছিল। খাবারের মধ্যে আধখানা রুটি আর একটা পেঁয়াজ। খেতে গিয়ে কিচে দেখে, পেঁয়াজটা থলেতে আছে, রুটিটুকু নাই। এই কদিনের মধ্যে তিন-তিনবার এরকম ঘটলো।

একথা কিচে কারও কাছে ফাঁস করে নাই। সে জানতো, উপদেবতারা মানুষকে নিয়ে খেলা সুরু করলে তা নিয়ে অভিযোগ করতে নাই। করলেই সর্বনাশ। তাঁরা মৌকা খুঁজতে থাকেন, পরের বারে উপদ্রব আরও বাড়িয়ে দেন।

ক্ষেতের কাজ সেরে কিচে যখন বাড়ী গেল, তার কেমন-কেমন ভাব দেখে বৌ জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে? কিচে জবাব দিল, "শরীরটা ভাল নাই।"

একটু পরেই কিন্তু খেতে ব'সে হাতার পর হাতা ঝোল সাবাড় করতে লাগলো সে। বৌ বললো, "শরীর ভাল নাই বলছো, এদিকে খাচ্ছো তো খুব।"

কিচে বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, "ও হ্যাঁ, খিদে তো ঠিকই আছে।" একে সকাল থেকে উপবাস, তার উপর নিজের দুঃখের কথা কাউকে বলতে না পারায় তার মনটা বিগড়ে গিয়েছিল।

একদিন এ অঞ্চলের সকলেই শুনলে, ঘণ্টা বাজায় একটা বদমাস কাক। সেটা আকাশে উড়ে বেড়ায়, আর ঘণ্টা বাজায়।

কিচে বললো, "এই দিব্বি কাটছি আমি,—মোক্ষম দিব্বি, সয়তানী ওর আমি বা'র করবো।"

পরদিন মাঠে যাবার সময় আধখানা রুটি আর পেঁয়াজের সঙ্গে সে থলির মধ্যে ভরে নিল, চারটে কড়াই শুঁটি আর চারগাছি সুতো। নিজের

ক্ষেতে পৌঁছে, কিচে প্রথমে তার গাধার পিঠ হতে জিনটা খুলে, সেটাকে চরতে ছেড়ে দিল। আর-দশজন চাষীর মতো কিচেরও অভ্যেস ছিল, নিজের গাধাটার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করা। প্রায়ই দেখা যেত, গাধাটা তার কথা শুনবার জন্যে একবার এ-কান একবার ও-কান তুলে ধরেছে, জবাব হিসেবে, মাঝে মাঝে একটা চাপা শব্দও যে সে করতো না, এমন নয়।

সেদিন কিচে তার গাধাটাকে উদ্দেশ ক'রে বললো, "কিচ্চিও, একটু খেয়াল রাখলে দেখতে পাবি, কেমন মজা হয়।"

তারপর, সে কড়াই শুটিগুলো ফুটো ক'রে ঘুটোর মধ্যে দিয়ে একগাছি ক'রে সুতো চালিয়ে দিয়ে জিনের সঙ্গে সেগুলোকে বাঁধলো। তারপর কড়াইশুটি চারটে খাবারের থলির উপর রেখে সে ক্ষেতের কাজে মন দিল।

একঘণ্টা কেটে গেল,—দুঘণ্টা, আকাশে ঘণ্টা বাজা শোনা যাচ্ছে ভেবে, কিচে মাঝে মাঝে হাতের কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে উঠে কান খাড়া করছিল।—কোথায় শব্দ! কিচে আবার বাদাম গাছের গোঁড়া খুঁড়তে লাগলো।

জলখাবার সময় হ'ল। রুটী আনতে যাবে, না, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে—ইতস্ততঃ করতে করতে শেষ পর্যন্ত সে খাবার আনাই স্থির করলো। কিন্তু খাবার থলির উপর কী চমৎকার ক'রে ফাঁদ পাতা আছে দেখে সে নিরস্ত হ'ল। ঠিক সেই সময় সে স্পষ্ট শুনলো, দূরে টুং-টাং টুং-টাং ঘণ্টা বাজছে। কিচে উপরের দিকে তাকালো, "ঐ যে আস্‌ছেন এবার!"

দারুণ উত্তেজিত হয়ে কিচে হামাগুড়ি দিয়ে চুপি চুপি সেখান হতে আর একটু দূরে গিয়ে লুকোলো।

কাক কিন্তু মাথার উপর অনেক উঁচুতে চক্কর দিতে থাকলো, নামবার নামও করলো না।

কিচে ভাবলো, কাকটা হয়তো তাকে দেখতে পাচ্ছে। সে আও একটু দূরে গিয়ে গা ঢাকা দিল।

কাক কিন্তু সেই উঁচুতেই রইলো, তার নেমে-আসার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। কিচের খুব ক্ষিধে বোধ হচ্ছিল, তবু হার মানবার পাত্র সে নয়। সে নিজের কাজে গিয়ে লাগলো, মনে মনে বললো, "দাঁড়াও না একটু, দেখাচ্ছি মজা।" কাক কিন্তু উঁচুতেই উড়তে থাকলো, যেন সয়তানি ক'রেই। কিচের ক্ষিধে বেড়ে চললো, ঐ তো তার রুটী—তবু যেন নাগালের বাইরে! কিচের মেজাজ বেজায় চটে গেল। পেটের নাড়ী জ্বলে যায়, তবু সে তার গোঁ ছাড়লো না। "নামতে তোকে হবেই শীগ্‌গির, ক্ষিধে কি আর তোরই পায়নি!"

কাকটা তাকে অবজ্ঞা ক'রেই যেন আকাশ থেকে জবাব দিচ্ছিল, "তুইও না!—মুইও না!"

সেদিনটা এইভাবেই কাটলো। কিচে যখন গাধার পিঠে জিন পরাতে এল, কড়াইশুটিগুলো তখনও জিন থেকে ঝুলছে—যেন কোনো নতুন ধরণের অলঙ্কার। কিচের মেজাজ তখন ভয়ানক খারাপ, তার যত রাগ গিয়ে পড়ল তার পঙ্‌খীরাজের উপর। যে রুটীর কথা চিন্তা করতে করতে তার মানসিক যন্ত্রণার অন্ত ছিল না, বাড়ী ফেরার পথে কামড়ে সেটাকে ছিঁড়ে খেতে লাগলো, একটু ক'রে রুটি চিবোয়,—আর ধরা না-দেওয়ার জন্যে কাকটাকে সে গাল পাড়ে, "বেটা সয়তান, চোর, বেইমান!"

পরের দিন সিদ্ধিলাভ হ'ল। আগের দিনের মতোই কিচে সযত্নে ফাঁদ পেতে তার কাজে লেগেছিল। অল্প একটু পরেই কাছাকাছি কোথায় জোর ঘণ্টা বাজার শব্দ তার কানে এল, সঙ্গে সঙ্গে কাকটার প্রাণপণ চীৎকার আর পাখা ঝাপটানি। কিচে দৌড়ে গিয়ে দেখলো, কাক ধরা পড়েছে, ঠোঁট থেকে বেরিয়ে-আসা সুতোটা গলায় জড়িয়ে গিয়ে তার দম বন্ধ হবার অবস্থা।

"হুঁ:, ফাঁদে পড়েছো ত যাদু!" কাকটার ডানা ধরে, কিচে তাকে সম্বোধন ক'রে বললো, "পড়লে তো ফাঁদে! ভাল কড়াইশুটি ওটা,—খুব ভাল! এবার আমার পালা! বজ্জাৎ জানোয়ার কোথাকার! এবার টের পাইয়ে দিচ্ছি!"

সুঁতো কেটে দিয়ে কিচে প্রথমেই কাকটার মাথায় দুই চাঁটি লাগালো: "এইটা হ'ল আমার ভয় লাগিয়ে দেওয়ার জন্যে, আর এইটা হ'ল গে, আমাকে উপোষ রাখার জন্যে।"

কাছেই পাহাড়ের ঢালুতে গাধাটা চরছিল। কাকের 'কা—কা' চীৎকার শুনে সেটা ভড়কে গেল,—মারলো এক দৌড়। কিচে অনেক ডাকাডাকি ক'রে তাকে থামালো. থামিয়ে, দূর থেকে তাকে হাতের কালা সয়তানটা দেখিয়ে কিচে বললো, "দেখছিস কিচ্চিও, এই যে সেই-টা! ধরেছি একে।"

কাকটাকে সে গাছের সঙ্গে বেঁধে নিজের কাজে গেল। মাটী খুঁড়তে খুঁড়তে সে ভাবতে লাগলো, কি ক'রে সবচেয়ে জব্বর প্রতিশোধ তোলা যায়। স্থির করলো, পাখা দুটো কেটে দিতে হবে, যেন বেটা আর উড়তে না পাবে। তারপর, ছেলেপিলেদের হাতে তুলে দিলেই হবে। তার নিজের ছেলে পাড়ার ছেলেগুলোর সঙ্গে মিলে কাকটাকে খুবই জ্বালিয়ে মারবে, মনে হতেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

সন্ধ্যা লাগলে কিচে গাধার পিঠে জিন চড়ালো, কাকটার পা দুটো বেঁধে সেটাকে ঝুলিয়ে নিল, গাধার লেজের নীচ-দিয়ে-টানা চামড়ার ফালিটার সঙ্গে। তারপর, গাধার পিঠে চড়ে সে বাড়ীমুখো হ'ল। কাকের গলার ঘণ্টাটা বেজে ওঠামাত্র, গাধার কান খাড়া হয়ে উঠলো, সেটা ভড়কে দাঁড়িয়ে গেল।

কিচে গাধার গলার দড়িটা টেনে এক ঝাঁকানি দিয়ে হাঁক ছাড়লো, "অর্ রে!"

গাধা আবার চলতে লাগলো। ধূলোভরা রাস্তায় চলতে চলতে প্রতিটি মন্থর পাদক্ষেপের সঙ্গে যে অদ্ভুত আওয়াজ তার কানে আসছিল, সেটা মোটেই তার ভাল লাগছিল না।

যেতে যেতে কিচে ভাবছিল, এর পর কেউ আর মিৎসারোর কাককে শূন্যপথে ঘণ্টা বাজাতে শুনবে না, ব্যাদড়া পাখীটা এখন তার হাতে পড়েছে। বেঁচে যে আছে, তার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না তো।

"এই! কি করছিস্ ব্যাটা? ঘুম দিচ্ছিস্ বুঝি?" কিচে মুখ ফিরিয়ে হাতের দড়িটা দিয়ে কাকটাকে এক ঘা ব'সিয়ে দিল।

"কা—"

এই কর্কশ আকস্মিক শব্দ তার কানে পৌছুতে গাধা চমকে উঠলো, ঘাড়টা যতখানা পারে আগের দিকে ঠেলে দিয়ে সে কান দুটোকে খাড়া ক'রে রইলো। কিচে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

গাধাটার কানের কাছে দড়ি দিয়ে এক ঘা ব'সিয়ে কিচে সাড়া দিল, "আব্রি কিচ্চিও, ভয় পাচ্ছিস্ কাকে?" দু-চার মিনিট বাদেই কিচে কাকটাকে আবার সেই প্রশ্ন করলে, "ঘুম হচ্ছে বুঝি?" প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কাকের গায়ে পড়লো আর এক ঘা। কাকটা এবার জবাব দিল আরও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—"কা"।

গাধাটার আর সহ্য হ'ল না, সে টেনে দৌড় দিল। হাতপায়ের সমস্ত শক্তি লাগিয়েও কিচে কিছুতেই তাকে বাগে আনতে পারলো না। গাধার দুরন্ত লাফানিতে ভয়ানক ঝাপটা খেতে খেতে কাকটা মরীয়া হয়ে একটানা কয়েকটা "কা—কা" আওয়াজ ছাড়লো। ভীষণ আতঙ্কে গর্দভনন্দনের গতি দ্রুত হ'তে দ্রুততর হয়ে উঠলো।

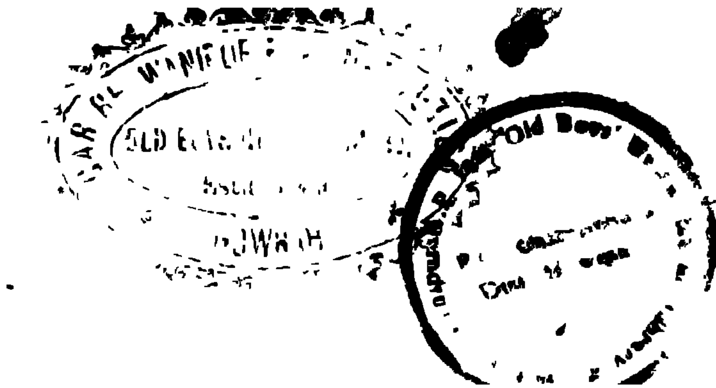
"কা—কা—কা"।

গাধার গলার দড়ি ধরে প্রাণপণ টানাটানি করতে করতে কিচেও

চেঁচামেচি সুরু করছিল। গাধা আর কাক পরস্পরের ভয়ে তখন একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে। গাধাটা যত জোরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, কাকের ঝাঁকুনি লাগে তত বেশী। এই পাগলা দৌড়েব হট্টগোলে রাত্রির বুকে হৃৎকম্প লেগে গেল। তারপর, ধপ্‌ ক'রে একটা শব্দ হ'ল।—তারপর, সব চুপচাপ।

পরেব দিন কিচেকে পাওয়া গেল একটা খাড়া পাহাড়েব তলায়, হাড়গুলো তার গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। সে পড়ে ছিল তার গাধাটার নীচে। গাধাটাও মারা গিয়েছিল। এক গাদা লাশ। সূর্যালোকে দেখা গেল, তা থেকে ধোঁয়া উঠছে। সত্যিই ধোঁয়া নয় সেটা,—এক ঝাঁক মাছি।

এর পর, একদিন সকালবেলার নির্মেঘ আকাশে মিৎসারোর কাকটাব আবার দর্শন পাওয়া গেল। উর্ধগগনে ঘণ্টা বাজিয়ে সে আবার মুক্তির পরম আনন্দ ভোগ করছিল। *



* ইতালীয় গল্প : লেখক—পিরানদেল্লো